সেই ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়াছিলাম। অথচ আমি ছিলাম রোজাদার। কিন্তু তাহার মন রক্ষা করিতে গিয়া আমাকে রোজা ভঙ্গ করিতে হইয়াছে। আবার কেহ হয়ত এইরূপ ওজর করে– আমার মাতার মনটা খুবই নরম এবং আমার সম্পর্কে বরাবরই তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। যেমন আজ তিনি মনে করিলেন, আজ আমি রোজা রাখিলে অসুস্থ হইয়া পড়িব। অবশেষে তাহার কথায় আজ আমাকে রোজা ভঙ্গ করিতেই হইল। এই সকল অবস্থা রিয়ার মধ্যে গণ্য। মানুষ এইরূপ বানোয়াট ওজর-আপত্তির কথা তখনই বলে, যখন রিয়ার জীবানু তাহার রগ-রেশায় ছড়াইয়া পড়ে।

যাহাদের অন্তরে এখলাস আছে, তাহারা এই বিষয়ে কোন চিন্তাই করে না যে, কে আমাদের সম্পর্কে কি ভাবিতেছে এবং কে কি মনে করিতেছে। সুতরাং রোজা না রাখা অবস্থায় তাহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানে যে, আল্লাহ পাক আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এই কারণে নিজের সম্পর্কে তাহারা আল্লাহ পাকের এলেমের খেলাফ কোন কথা নিজের মুখ হইতে বাহির করে না। আর যখন রোজা রাখে, তখন এই বিষয়ে আল্লাহর অবগতিতেই তুষ্ট থাকে এবং ইহাতে অপর কাহাকেও শরীক করিতে চাহে না। মানুষ কখনো মনে করে যে, আমি যদি আমার এবাদত জাহির করি, তবে আমার অনুকরণে লোকেরাও এবাদত করিবে এবং আমার মত তাহারাও ছাওয়াব হাসিল করিতে পারিবে। এইরূপ ধারণার ফলে শয়তানের পক্ষে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার প্রবল সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উপরে রিয়ার স্তরসমূহ আলোচনা করা হইল। বস্তুতঃ একজন রিয়াকার সর্ব স্তরেই আল্লাহর আজাবের শিকার হয়। রিয়া হইল আত্মার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এই সর্বনাশা রিয়া কেমন করিয়া যে মানবাত্মায় প্রবেশ করে, তাহা সকলে অনুভবও করিতে পারে না। পিপীলিকার চলনের মতই উহা নীরব-সন্তর্পনে আত্মায় প্রবেশ করিয়া মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। সাধারণ মানুষ তো বটেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-ফাজেলগণও এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হন।

পিপীলিকার চলন অপেক্ষা গোপন রিয়া

রিয়া দুই প্রকার। জলি (প্রকাশ্য) ও খফী (গোপন)। প্রকাশ্য রিয়া হইল– যাহা ছাওয়াবের নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই রিয়া একেবারেই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। ইহা অপেক্ষা গোপন রিয়া হইল– যেই রিয়া আমলের কারণ হয় না বটে, কিন্তু ছাওয়াবের নিয়তে যেই আমল করা হয়, এই রিয়ার কারণে সেই আমলটি সহজ হইয়া যায়। যেমন এক ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্থ। কিন্তু এই তাহাজ্জুদে তাহার কিছুটা কষ্ট হয়। অর্থাৎ

সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বিছানা ত্যাগ করিতে মনের সহিত কিছুটা যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু কোন দিন যদি বাড়ীতে মেহমান থাকে, তবে এই তাহাজ্জুদে সে এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব করে এবং ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদ পড়িতে যেই কষ্ট হইত, আজ মেহমানের উপস্থিতির কারণে সেই কষ্টের কিছুই অনুভব হয় না। অবশ্য এই কথা সত্য যে, এই ব্যক্তি যদি তাহাজ্জুদের মাধ্যমে ছাওয়াবের আশা না করিত, তবে নিছক মেহমানের সম্মুখে রিয়া করার উদ্দেশ্যেই তাহাজ্জুদ পড়িত না।

উপরোক্ত গোপন রিয়া অপেক্ষা আরো গোপন রিয়া হইল, যাহা আমলের কারণ হয় না এবং আমলকে সহজও করে না। এই রিয়া অন্তরে গোপন থাকে। আমলের উপর এই রিয়ার কোন প্রভাব নাই বিধায় কোনরূপ লক্ষণ ছাড়া ইহার পরিচয় পাওয়াও সম্ভব হয় না। এই রিয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন জানিতে পারে যে, মানষ তাহার আমল সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছে, তখন সে অন্তরে আনন্দ ও পুলক অনুভব করে। যেমন অনেক নেককার-পরহেজগার ও নিষ্ঠাবান আবেদ যাহারা রিয়াকার নহে এবং রিয়াকে পছন্দও করে না; কিন্তু যখনই তাহার এবাদত সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়, তখনই সে অন্তরে এক প্রকার আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। এই সুখ ও আনন্দের ফলে মন হইতে এবাদতের কষ্টও দূর হইয়া যায়। বলাবাহুল্য, মানব-অন্তরে সুপ্ত গোপন রিয়াই হইল এই আনন্দের উৎস। আর এই আনন্দই অন্তরে রিয়ার উপস্থিত প্রমাণ করে। অন্তর যদি মানুষের প্রতি মনোযোগী না হইত, তবে কখনো এই আনন্দ অনুভব হইত না। পাথরের মধ্যে যেমন আগুন লুকাইয়া থাকে এবং অপর কিছুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে সেই আগুনের বিচ্ছুরণ ঘটে, তদ্রূপ অন্তরে সুপ্ত রিয়া মানুষের অবগতির স্পর্শে আসিয়া বিকশিত হয়। এখন মানুষ যদি এই রিয়ার আনন্দকে ঘৃণা দ্বারা দূর করার চেষ্টা না করে, তবে এই আনন্দই গোপন রিয়ার খাদ্য ও শক্তির যোগান দেয়। এই পর্যায়ে সে কামনা করে– যেকোন উপায়েই হউক, মানুষ তাহার এবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানিতে পারিলেই হইল। ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে হউক বা স্পষ্ট অবগতির মাধ্যমেই হউক।

অনেক সময় এই রিয়া এমনই গোপন হয় যে, এই পর্যায়ে রিয়াকার ইশারা-ইঙ্গিতে বা স্পষ্টভাবে অর্থাৎ কোনভাবেই তাহার এবাদত সম্পর্কে মানুষকে অবগত করিতে চাহে না। বরং সে হয়ত কামনা করে, তাহার স্বভাব-প্রকৃতি ও শারীরিক অবস্থা দ্বারাই যেন মানুষ তাহার এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়। যেমন তাহার শারীরিক দুর্বলতা, চেহারার বিমর্ষভাব, ক্ষীণস্বর, শুষ্কওষ্ঠ, চোখে অশ্রুর চিহ্ন, দীর্ঘ অনিদ্রার ছাপ– ইত্যাদি যাহা দ্বারা তাহার ক্রমাগত এবাদত ও মোজাহাদা এবং তাহাজ্জুদের আলামত প্রকাশ পায়।

এতদ্ অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম ও গোপন রিয়া হইল– এই ক্ষেত্রে রিয়াকার নিজের এবাদত সম্পর্কে মানুষকে অবগত করিতে চাহে না এবং কোনক্রমে তাহার এবাদত প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহাতেও আনন্দ অনুভব করে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা অবশ্যই কামনা করে যেন মানুষ তাহাকে দেখামাত্র আগে ছালাম করে, হাসিমুখে সাক্ষাত করে, সম্ভ্রম আচরণ করে, তাহার প্রশংসা করে, তাহার কোন প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে পারিলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, আসন ছাড়িয়া তাহাকে বসিতে দেয়– ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে কেহ ত্রুটি করিলে মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং মানুষের এইরূপ আচরণ তাহার নিকট অসঙ্গত মনে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে– সে যেন এইরূপ সম্মান ও ইজ্জত-এহতেরাম নিজের এমন সব এবাদতের বিনিময়ে প্রত্যাশা করে যাহা সে অতি গোপনে আদায় করে এবং মানুষকে জানিতেও দেয় না। ইতিপূর্বে সে যখন এইসব এবাদত করিত না, তখন লোকেরা তাহাকে এইরূপ ইজ্জত-সম্মান না করিলে তখন উহা তাহার নিকট খারাপ মনে হইত না। অর্থাৎ এইসব এবাদত করিয়া সে কেবল আল্লাহ তায়ালার অবগতিতেই তুষ্ট নহে বিধায় তাহার অন্তর গোপন রিয়ার শিকার হইয়াছে। এই রিয়া পিপীলিকার চলন হইতেও অধিক সন্তর্পনে তাহার অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছে। এহেন গোপন রিয়াও মানুষের আমল বরবাদ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্ম রিয়া হইতে কেবল ছিদ্দীকগণ ব্যতীত অপর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ক্বারীগণকে বলিবেন, লোকেরা কি তোমাদিগকে কম দামে পন্য দিত না? মানুষ কি তোমাদিগকে আগে ছালাম করিত না? তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করিত না? এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কে হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لا اجر لكم قد استوفيتم اجوركم

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য কোন পুরস্কার নাই, তোমরা নিজেদের পুরস্কার দুনিয়াতেই আদায় করিয়া লইয়াছ।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ) বলেন, ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ হইতে বর্ণিত, জনৈক বুজুর্গ একবার তাহার সাথী-সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমি আল্লাহর নাফরমানীর ভয়ে নিজের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজন সব ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আমার আশংকা হইতেছে, সম্পদশালীগণ নিজেদের ধনসম্পদের কারণে যেমন আল্লাহর নাফরমানী করে, তদ্রূপ আমরাও আমাদের দ্বীনদারীর কারণে আল্লাহর নাফরমান হইয়া যাই কি-না। আমাদের অবস্থা কিন্তু অনেকটা সেইরূপই মনে হইতেছে। কাহারো সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাত হয়, তখন আমরা আশা করি যেন আমাদের দ্বীনদারীর কারণেই সেই ব্যক্তি আমাদের

ইজ্জত করে। আমরা কাহারো নিকট কোন কথা বলিলে এইরূপ কামনা করি যেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করা হয়। কোন পন্য ক্রয় করিলে আশা করি যেন আমাদের নিকট হইতে উহার মূল্য কম রাখা হয়।

উপরোক্ত বুজুর্গের এই হালাতের কথা যখন সেই দেশের বাদশাহ জানিতে পারিলেন, তখন তিনি রাজকীয় ফৌজসহ বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন। এদিকে বাদশাহর আগমন সংবাদ পাইয়া চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বুজুর্গ এই অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লোক জড়ো হওয়ার কারণ কি? লোকেরা বলিল, মহামান্য বাদশাহ সালামাত আপনার সঙ্গে মোলাকাত করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষেই এই লোক সমাগম। বুজুর্গ ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া শাগরিদকে খানা হাজির করিতে বলিলেন। শাগরিদ সঙ্গে সঙ্গে খাবার আনিয়া হাজির করিল। এইবার তিনি জীব-জানোয়ারের মত উহা গোগ্রাসে খাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বাদশাহ বুজুর্গের হুজুরার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন। বাদশাহ লক্ষ্য করিলেন, কক্ষের ভিতর সেই বুজুর্গ গোগ্রাসে আহার করিতেছেন। দৃশ্যটি বাদশাহর নিকট খুবই দৃষ্টিকটু মনে হইল (এবং ইতিপূর্বে তিনি বুজুর্গ সম্পর্কে যেই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিলেন সহসাই যেন তাহা ঘৃণায় পর্যবসিত হইল)। অতঃপর তিনি নেহায়েত সৌজন্য রক্ষার্থে আগাইয়া গিয়া বুজুর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বুজুর্গ সংক্ষেপে জবাব দিলেন, আমি ভাল আছি। বাদশাহ বলিলেন, এখানে ভাল'র কোন আশা করা যায় না। এই মন্তব্যের পরই তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বাদশাহ চলিয়া যাওয়ার পর বুজুর্গ আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিলেন যে, বাদশাহ তাহার নিন্দা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহ পাকের মোখলেস বান্দাগণের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। এই নেক বান্দাগণ সর্বদা গোপন রিয়ার ভয়ে ভীত থাকেন এবং এই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদা সতর্ক থাকেন। নিজেদের আমল ও এবাদতের উপর হইতে মানুষের নজরকে ফিরাইয়া রাখার জন্য অনেক সময় কৌশলও অবলম্বন করেন। সাধারণ ভাবে মানুষ নিজের আয়েব ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ নিজেদের নেক আমলসমূহ গোপন রাখার কাজে সচেষ্ট থাকেন, যেন তাহাদের নেক আমলসমূহে রিয়ার সংমিশ্রণ ঘটিতে না পারে। ফলে যেন কেয়ামতের দিন নিজেদের আমল ও এখলাসের বিনিময় হাসিল করিতে পারেন। আল্লাহর ওলীগণ এই কথা ভাল করিয়াই জানেন যে, রোজ কেয়ামতে এখলাসপূর্ণ আমল ব্যতীত অন্য কোন আমলই কবুল হইবে

না। কেয়ামতের সেই কঠিন দিবসে কেবল নেকীরই প্রয়োজন হইবে– অপর কোন সম্পদ সেই দিন কাজে আসিবে না। না সন্তানাদি কোন কাজে আসিবে, না পিতা সন্তানদের কোন সাহায্য করিতে পারিবে। সকলেই আপন চিন্তায় নফসী! নফসী! বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে।

রিয়ার কারণে সৃষ্ট মনের আনন্দের প্রকার ভেদ

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আমল প্রকাশ হওয়ার পর সকলের মনেই কিছু না কিছু আনন্দ অবশ্যই প্রকাশ পায়। এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইবে, লোক সমাজে যার আমল প্রকাশ হওয়ার পরও মনে কোনরূপ আনন্দ অনুভূত হয় না। সুতরাং আমল প্রকাশ হওয়ার কারণে সৃষ্ট মনের আনন্দ মাত্রই কি নিন্দনীয়, না উহার কোন কোনটি প্রশংসনীয়ও আছে। এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, আমল প্রকাশ হওয়ার ফলে সৃষ্ট মনের সব আনন্দই নিন্দনীয় নহে। এই আনন্দ মোট পাঁচ প্রকার এবং উহার চারিটি উত্তম ও একটি মন্দ। নিম্নে পৃথকভাবে উহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম প্রকার

প্রথম প্রকার আনন্দ হইল– আবেদের উদ্দেশ্য নিজের আমল ও এবাদত গোপন রাখা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যেই এবাদত করা। কিন্তু উহার পরও যখন কোন কারণে তাহার এবাদত প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সে এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইল যে, আমার এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ পাকই মানুষকে অবহিত করিয়াছেন এবং তিনিই আমার উত্তম বিষয়গুলি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার কৃপা ও দয়া হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমার তো ইচ্ছা ছিল, আমার এবাদত ও গোনাহ উভয়টিই গোপন থাকুক, কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমার গোনাহ ও ত্রুটিসমূহ গোপন করিয়া আমার এবাদত ও উত্তম কর্মসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা বড় অনুগ্রহ আর কি হইতে পারে যে, তিনি আমার গোনাহ সমূহ ঢাকিয়া রাখিয়া আমার এবাদতগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন? পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের এহেন অনুগ্রহ ও দয়ার কথা ভাবিয়া আনন্দিত হওয়া খারাপ নহে, বরং উত্তম। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا =

অর্থঃ "বলুন, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে। সুতরাং ইহারই প্রতি তাহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।" (সূরা ইউনুসঃ আয়াত ৫৮)

অর্থাৎ আবেদ তাহার এবাদত প্রকাশ হওয়ার কারণে আনন্দিত হয় নাই; বরং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া এবং আল্লাহর নিকট তাহার কবুলিয়াতের

কারণেই সে আনন্দিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার

এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ পাক যেমন দুনিয়াতে আমার গোনাহ-খাতা ঢাকিয়া রাখিয়া আমার নেক আমলসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; আখেরাতেও তিনি আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারই করিবেন। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

ما ستر الله على عبد ذنبا في الدنيا الا ستره عليه في الاخرة

অর্থঃ 'দুনিয়াতে আল্লাহ পাক যেই গোনাহ গোপন রাখেন, আখেরাতেও সেই গোনাহ গোপন রাখিবেন।" (মুসলিম শরীফ)

তৃতীয় প্রকার

এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া মন্দ নহে যে, মানুষ আমার এই এবাদতের অনুসরণ করিবে এবং এইভাবেই আমি দ্বিগুণ ছাওয়াব লাভ করিব। অর্থাৎ আমার আমলের ছাওয়াব তো আমি পাইবই; তদুপরি যাহারা আমার দেখাদেখি আমল করিবে বা আমার আমলের অনুসরণ করিবে উহার ছাওয়াবও আমি প্রাপ্ত হইব। যেমন, হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– "যেই ব্যক্তি কোন ছাওয়াবের কাজ করে এবং মানুষ তাহার অনুসরণ করে, সে অনুসারীদের সমান ছাওয়াব পাইতে থাকে এবং তাহাদের ছাওয়াবও হ্রাস করা হয় না।" সুতরাং কোন কারণে ছাওয়াব বৃদ্ধি পাইলে আনন্দিত হওয়াই সঙ্গত বটে।

চতুর্থ প্রকার

চতুর্থ প্রকার হইল, এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া যে, যাহারা তাহার এবাদতের কথা জানিতে পারিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছে, প্রকারান্তরে তাহারা আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের প্রতিই নিজেদের সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত করে, তাহাদিগকে মোহাব্বত করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহাদের অন্তরেও এবাদতের প্রতি অনুরাগ বিদ্যমান এবং এবাদতের প্রতি আবেগ-অনুরাগ আছে বলিয়াই একজন আবেদের প্রশংসা করিয়াছে। নতুবা এমন বহু লোক আছে, যাহারা কোন আবেদকে দেখিলে হিংসা করে, নিন্দা করে এবং তাহাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তো একজন আবেদের প্রশংসা দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানের স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়। আর এই ক্ষেত্রে আবেদের এখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় হইল– নিজের প্রশংসা শুনিয়া যেমন অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয়, অপরের প্রশংসা শুনিয়াও অনুরূপ আনন্দ অনুভূত হওয়া।

পঞ্চম প্রকার

প্রঞ্চম প্রকারের আনন্দটি হইল মন্দ ও নিন্দনীয়। অর্থাৎ এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া যে, আমার এবাদত-বন্দেগীর কারণেই মানুষের অন্তরে আমার মর্যাদার আসন স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার ফলেই তাহারা আমার প্রশংসা করিতে শুরু করিয়াছে। মানুষ এখন আমার তাজীম করে, সব কাজে আমাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আমার সর্ববিধ খেদমতে আগাইয়া আসে। এবাদতকারীর এই জাতীয় আনন্দ নিন্দনীয় ও গর্হিত।

এমন গোপন ও প্রকাশ্য রিয়া যাহা আমলকে বাতিল করিয়া দেয়

পরিপূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত আমল সম্পন্ন করিবার পর যদি উহাতে 'রিয়া' আসিয়া আক্রমণ করে, তবে এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে- যদি এবাদত শেষ হওয়ার পর কেবল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ার কারণে আনন্দ অনুভূত হয় এবং নিজে এবাদত প্রকাশ না করে তবে এই আনন্দের কারণে এবাদত বাতিল হইবে না। কেননা, তাহার এবাদত রিয়ামুক্ত অবস্থায় এখলাসের সাথেই সমাপ্ত হইয়াছে। এবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোন রিয়া হয়, তবে আশা করা যায় উহা দ্বারা এবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। বিশেষতঃ এবাদতকারী যদি নিজে তাহার এবাদতের কথা প্রকাশ না করে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তাহা প্রকাশ করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও এবাদত বাতিল হওয়ার কোন কারণ নাই। অবশ্য রিয়ামুক্ত অবস্থায় এবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর এবাদতকারী যদি নিজের আগ্রহে তাহা প্রকাশ করে, তবে এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ আছে। হাদীসে পাকের বিবরণ ও মনীষীবর্গের ভাষ্য মতে ইহা এবাদতকে বাতিলও করিয়া দেয়।

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেনঃ আমি গত রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, এই এবাদতে সেই ব্যক্তির অংশ এতটুকুই, সে তাহার অংশ লইয়া গিয়াছে।

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমি সারা জীবন রোজা রাখিয়াছি। তিনি এরশাদ করিলেনঃ তুমি রোজাও রাখ নাই এবং রোজাহীন অবস্থায়ও জীবন অতিবাহিত কর নাই। (মুসলিম শরীফ)

মোটকথা, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তব্য এই কথাই প্রমাণ করে যে, এবাদত

করার সময়ই লোকটির অন্তরে রিয়া বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই সে এবাদত সম্পন্ন করার পর নিজের সেই এবাদতের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অন্যথায় এবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর অনুষ্ঠিত কোন কর্ম এবাদতের ছাওয়াবকে বাতিল করিয়া দিবে- ইহা কেয়াস ও সাধারণ বিবেচনার পরিপন্থী। বরং কেয়াস তো এই কথাই বলে যে, রিয়ার পূর্বে কৃত আমলের ছাওয়াব সে পাইবে এবং আমল সম্পন্ন করার পর উহাকে রিয়ার মাধ্যম বানাইবার কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

এক ব্যক্তি হয়ত এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত নামাজ আদায় করিতেছে। কিন্তু এই নামাজ আদায়রত অবস্থায় যদি কিছু রিয়াও আসিয়া যুক্ত হয়, তবে তাহার নামাজের ছাওয়াব বাতিল হইয়া যাইবে। যেমন- এক ব্যক্তি যখন নফল নামাজ পড়িতেছিল, তখন সেখানে দেশের বাদশাহ বা অন্য কতক মানুষের আগমন ঘটিল। ফলে নামাজী লোকটি মনে মনে এইরূপ কামনা করিল যেন আগন্তুকগণ তাহাকে অবলোকন করে। কিংবা নামাজের মধ্যেই তাহার কোন হারাইয়া যাওয়া বস্তুর কথা স্মরণ হওয়ার পর নামাজ ভঙ্গ করিয়া উহা সন্ধান করার ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই আশংকায় সে নামাজ ত্যাগ করিল না যে, এইরূপ করিতে দেখিলে লোকেরা খারাপ মনে করিবে। এই সময় যদি সেখানে কোন মানুষ উপস্থিত না থাকিত, তবে সে নামাজ ভঙ্গ করিয়াই সেই হারাইয়া যাওয়া বস্তুটির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইত। এমতাবস্থায় তাহার নামাজের ছাওয়াব বাতিল হইয়া যাইবে। ফরজ নামাজে এইরূপ হইলে তাহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে।

হযরত মোয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

العمل كالوعاء اذا طاب اخره طاب اوله

অর্থঃ "আমল হইল পাত্রের মত। উহার শেষ ভাল হইলে শুরুও ভাল হইবে।" (ইবনে মাজা)

আরেকটি অবস্থা হইল, নামাজের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গেই রিয়ার ইচ্ছা করা এবং নামাজের শেষ পর্যন্ত এই রিয়ার ইচ্ছা অব্যাহত রাখা। যদি এইরূপ করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে সর্বসম্মত মত হইল- এই নামাজ মূল্যহীন এবং তাহা কাজা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি নামাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই রিয়ার উপর অনুতপ্ত হইয়া এস্তেগফার করে এবং ছালাম ফিরাইবার পূর্বেই রিয়া বর্জন করে, তবে এই নামাজ সম্পর্কে তিন প্রকার মতামত বর্ণিত আছে।

১. কেহ কেহ বলেন, রিয়ার ইচ্ছার সহিত নামাজ শুরু করিলে সেই নামাজ

শুদ্ধ হয় না। এই ক্ষেত্রেও যেহেতু নামাজের সূচনাতেই রিয়ার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং তাহার নামাজ হয় নাই। নূতনভাবে নামাজের নিয়ত করিতে হইবে।

২. কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ব্যক্তির নিয়ত ঠিক থাকিবে বটে, কিন্তু নামাজের অপরাপর কার্যক্রম যেমন, রুকু-সেজদা ইত্যাদি পুনরায় করিতে হইবে। নিয়ত বাতিল না হওয়ার কারণ হিসাবে তাহারা বলেন, নিয়ত হইল আক্‌দ বা বন্ধন। আর রিয়া হইল অন্তরের একটি চাহিদার নাম। তো অন্তরের এই চাহিদার কারণে নিয়ত বাতিল হইবে না।

৩. আবার কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ব্যক্তির নামাজ পুনরায় দোহরানোর প্রয়োজন নাই। বরং সে মনে মনে এস্তেগফার করিয়া এখলাসের সহিত নামাজ শেষ করিবে। শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য। এই ব্যক্তি যদি এখলাসের সহিত নামাজ শুরু করিয়া রিয়ার উপর শেষ করিত, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইত। কিন্তু এখানে উহার বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ রিয়া দ্বারা শুরু করিয়া এখলাসের সহিত শেষ করিয়াছে। সুতরাং তাহার নামাজ বাতিল হওয়ার কোন কারণ নাই। উহার উদাহরণ এইরূপ– কোন পরিষ্কার কাপড়ে নাপাকী লাগার পর যদি উহা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তবে উহা সেই আগের পাক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

উপরে বর্ণিত শেষোক্ত দুইটি মত ফেকাহের ধারণার পরিপন্থী। বিশেষতঃ "নিয়ত ঠিক থাকিবে কিন্তু রুকু-সেজদা পুনরায় করিতে হইবে" এই উক্তিটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, নিয়ত বহাল রাখিয়া যদি রুকু-সেজদা বাতিল করা হয়, তবে এইগুলিকে নামাজ বহির্ভূত কর্ম বলিয়া মানিতে হইবে। আর নামাজ বহির্ভূত কোন কর্ম যদি নামাজের ভিতর করা হয়, তবে নামাজ কেমন করিয়া শুদ্ধ হইবে?

অনুরূপভাবে এই উক্তিটিও সঠিক নহে যে, "এখলাসের সহিত নামাজ শেষ করাই যথেষ্ট এবং শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য।" এই উক্তিটি দুর্বল হওয়ার কারণ হইল, 'রিয়া' নিয়তের বিশুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করে। তো নিয়তই যদি সঠিক না হয়, তবে নামাজ সঠিক অবস্থায় শেষ হইবে কি রূপে?

ফেকাহের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে যেই অবস্থাটি বিশুদ্ধ তাহা হইল– কোন আমল যদি শুধু রিয়ার উদ্দেশ্যেই করা হয়, অর্থাৎ– সেই আমলটি যদি ছাওয়াব হাসিল কিংবা আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে করা না হয়, তবে সেই আমলের সূচনাই সঠিক হইবে না। তো নামাজের সূচনা হইল নিয়ত বা তাহ্‌রীমা। এখন নামাজের তাহ্‌রীমাই যদি শুদ্ধ না হয়, তবে উহার পরে যাহা যাহা করা হইবে, উহার কোনটিই শুদ্ধ হইবে না।

উপরোক্ত অবস্থাটির উদাহরণ যেন এইরূপ– মনে করুন, এক ব্যক্তি একা

থাকিলে নামাজ পড়িত না। কিন্তু মানুষের উপস্থিতি দেখিয়া সে নামাজের নিয়ত বাঁধিয়া লইল। এই ক্ষেত্রে মনে করা হইবে যেন তাহার নামাজের নিয়তই হয় নাই। কেননা, নিয়ত বলা হয় দ্বীনের কোন হুকুম পালনের ইচ্ছাকে। কিন্তু এখানে দ্বীনের হুকুম পালনের ইচ্ছা করা হয় নাই। অবশ্য অবস্থা যদি এইরূপ হইত যে, মানুষের উপস্থিতি না হইলেও সে নামাজ পড়িত; কিন্তু মানুষের উপস্থিতির কারণে (তাহাদের প্রশংসা লাভের আশায়) এই নামাজে তাহার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে মনে করা হইবে– এখানে দুইটি ইচ্ছা একত্রিত হইয়াছে। একটি হইল মানুষের প্রশংসা কুড়াইবার ইচ্ছা এবং অপরটি দ্বীনের হুকুম পালন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাওয়াবের নিয়ত পরিমাণ বিনিময় পাইবে এবং যেই পরিমাণ রিয়ার নিয়ত করিয়াছে সেই পরিমাণ আজাব ভোগ করিবে। একটির কারণে অপরটি বাতিল হইবে না। অর্থাৎ যেই পরিমাণ ভাল আমল করিয়াছে সেই পরিমাণ ছাওয়াব পাইবে এবং মন্দ আমলের পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিবে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ –

অর্থঃ "কেহ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহা দেখিতে পাইবে এবং অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।" (সূরা যিলযালঃ আয়াত ৭ – ৮)

নিয়তের ত্রুটির কারণে যেই নামাজ বাতিল হইয়া যায় সেই নামাজ যদি নফল হয়, তবে উহার বিধান সদকার মত। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আনুগত্য ও নাফরমানী এই দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান। কিন্তু তবুও এইরূপ বলা যাইবে না যে, তাহার নামাজ বাতিল এবং তাহার এক্তেদা শুদ্ধ নহে। মনে করুন, এক ব্যক্তি তারাবীহ-এর নামাজ পড়িল এবং তাহার অবস্থা দ্বারাও বুঝা গেল যে, তাহার উদ্দেশ্য কেবল সুন্দর তেলাওয়াত শুনানো। অর্থাৎ যদি জামায়াতের আয়োজন না হইত, তবে সে তারাবীহ পড়িত না। এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে এমন বলা যাইবে না যে, তাহার পিছনে নামাজ হইবে না। এমন ধারণা করাও ঠিক নহে। বরং মুসলমান সম্পর্কে এমন ধারণাই করিতে হইবে যে, নফল নামাজ দ্বারা সে ছাওয়াবেরই নিয়ত করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিয়ত বিশুদ্ধ এবং তাহার পিছনে নামাজ পড়াও জায়েজ যদিও তাহার অন্তরে ছাওয়াবের ইচ্ছার পাশাপাশি অন্য ইচ্ছাও যুক্ত থাকে।

পক্ষান্তরে যদি ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে এইরূপ দুইটি অবস্থা একত্রিত হয় এবং একত্রে এই উভয় ইচ্ছার কারণে নামাজ আদায় করা হয়, তবে তাহার ফরজ নামাজ আদায় হইবে না। কেননা, শরীয়তের বিধান হিসাবে ফরজ নামাজ আদায়ের ইচ্ছা তাহার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় নাই।

অন্তর হইতে রিয়া দূর করার উপায়

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, রিয়ার কারণে মানুষের আমল বরবাদ হইয়া যায় এবং রিয়াকার আল্লাহর আজাব ও গজবের শিকার হয়। সুতরাং রিয়া হইল মানবাত্মার এক সর্বনাশা ব্যাধি। এই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য উত্তম চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যক– চাই তাহা যত কষ্টকরই হউক। কেননা, ঔষধের তিক্ততা রোগের জন্য হিতকর হয়। রিয়া হইতে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। চাই সে কম বয়সী শিশুই হউক। একজন শিশুর কোন বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে না। সে মানুষকে যাহা করিতে দেখে, উহাই তাহার কচি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। সুতরাং সে যখন দেখে মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে, তখন সে অবচেতন মনেই বানোয়াট ও প্রতারণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শিশুর কচি মানসপটে অঙ্কিত এইসব অবস্থা ক্রমে তাহার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং পরিণত বয়সে তাহার আচারআচরণ দ্বারা এইগুলিই প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রমে এই দুষ্ট স্বভাবগুলি মানব প্রকৃতির এমন গভীরে গিয়া বদ্ধমূল হয় যে, তখন আর খুব সহজে ঐগুলি স্বভাব হইতে নির্মূল করা সম্ভব হয় না। এই পর্যায়ে কঠিন মোজাহাদা ও ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমেই তাহা স্বভাব হইতে দূর করিতে হয়। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় এই মোজাহাদা খুব কষ্ট কর হইলেও পর্যায়ক্রমে তাহা সহজ হইয়া যায়।

রিয়ার চিকিৎসার দুইটি পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে রিয়ার চিকিৎসা হইতে পারে। প্রথমতঃ রিয়ার মূল এবং উহার শিকড় সমূহ উপড়াইয়া ফেলা যাহা দ্বারা রিয়ার বিষবৃক্ষটি জীবনী শক্তি আহরণ করে। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে রিয়ার ক্ষতিকারক বিষয়সমূহ মিটাইয়া দেওয়া।

প্রথম পদ্ধতিঃ রিয়ার মূল ও শিকড় উৎপাটন

এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা যাইবে রিয়ার মূল এবং উহার যাবতীয় উপকরণ সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভের পর। এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রিয়ার প্রধান উপাদান হইল, যশখ্যাতি ও সম্মানের মোহ। এই বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করিলে যেই তিনটি বিষয় আলোচনায় আসে তাহা হইল

১. প্রশংসাপ্রীতি।

২. নিন্দার প্রতি ঘৃণা এবং

৩. মানুষের মালিকানাধীন বস্তুর প্রতি লালসা।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় হইল রিয়ার উপকরণ এবং এই সবের ফলেই রিয়া অস্তিত্ব লাভ করে। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা দ্বারাও এই বিষয়টির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! যেই ব্যক্তি হামিয়্যাতের জন্য জেহাদ করে, তাহার সম্পর্কে কি হুকুম? হামিয়্যাত অর্থ হইল– সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই বিষয়ে লজ্জাবোধ করে যে, সে নিজে পরাজিত হইবে কিংবা পরাজয়ের কারণে লোকেরা তাহাকে মন্দ বলিবে। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি মর্যাদা লাভ ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে তাহার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? মর্যাদা লাভের অর্থ হইলঃ যশ-খ্যাতি ও মানুষের অন্তরে স্থান পাওয়ার বাসনা। আর জিকির অর্থ মৌখিক প্রশংসা লাভের বাসনা।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব বেদুঈনের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলিলেন–

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর পথে আছে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধাদের হালাত অনুযায়ী তাহাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে যে, অমুক ব্যক্তি প্রশংসা লাভের আশায় যুদ্ধ করিতেছে এবং অমুক ব্যক্তি দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। "দেশের জন্য" দ্বারা পার্থিব ধন-সম্পদের কথা বুঝানো হইয়াছে।

অনেক সময় মানুষ প্রশংসা লাভের বাসনা করে না বটে, কিন্তু নিন্দার পীড়ন হইতে বাঁচিতে চাহে। যেমন কোন কৃপণ যদি এমন কতক দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আটকা পড়ে, যাহারা আল্লাহর পথে প্রচুর দান করিতেছে, তখন সেই কৃপণ ব্যক্তিটিও কিছু দান করিয়া দেয়, যেন লোকেরা তাহাকে কৃপণ বলিতে না পারে। অর্থাৎ এই ব্যক্তির প্রশংসা লাভের কোন উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাহার উদ্দেশ্য হইল– অপমানের দুর্নাম হইতে নিজেকে রক্ষা করা। অনুরূপভাবে কোন ভীতু হয়ত রণাঙ্গনে কেমন করিয়া দুধর্ষ যোদ্ধাদের কাতারে ঢুকিয়া পড়িল। পরে সে পালাইতে চাহিল কিন্তু মানুষ দেখিয়া ফেলিলে তাহাকে ভীতু বলিবে, এই দুর্নামের ভয়ে পালাইতেও পারিল না। অতঃপর বিশেষ সতর্কতার সহিত নিজেকে বাঁচাইয়া মামুলী ধরনের কিছু আক্রমণও করিল যেন মানুষ তাহাকে 'ভীতু' বলিতে না পারে। এই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বীর যোদ্ধাদের সারিতে থাকিয়া প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করিয়া 'বীরযোদ্ধা' খ্যাতিলাভ তাহার

উদ্দেশ্য নহে। বরং কাপুরুষতার দুর্নাম হইতে আত্মরক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। অনেক সময় মানুষ প্রশংসার আনন্দের উপর সবর করিতে পারে বটে, কিন্তু নিন্দার কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। এই কারণেই (নিজের অজ্ঞতার ক্ষেত্রে) অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে জিজ্ঞাসা করে না। এমতাবস্থায় এলেম ছাড়াই সে শরীয়তের রায় ঘোষণা করিয়া দেয় এবং নিজেকে শরীয়ত বিষয়ে পণ্ডিত বলিয়া দাবী করে। অথচ শরীয়ত সম্পর্কে তাহার কোন ধারণাই নাই।

রিয়ার বিশেষ চিকিৎসা

ইহা এক অনস্বীকার্য সত্য যে, মানুষ যখন কোন বস্তুকে নিজের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর মনে করে তখনই সে উহা পাওয়ার বাসনা করে। এখন সেই উপকার উপস্থিত ক্ষেত্রেই হউক কিংবা ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা হউক। কিন্তু সে যদি এই কথা জানিতে পারে যে, সেই বস্তুর উপকারীতা ক্ষণস্থায়ী এবং ভবিষ্যতের জন্য উহা ক্ষতিকারক তবে উহা পাওয়ার বাসনা ত্যাগ করা তাহার জন্য কষ্টকর হইবে না। যেমন এক ব্যক্তি মধুর গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু সে যদি এই কথা জানিতে পারে যে, উহার সহিত বিষ মিশ্রিত আছে, তবে সে কস্মিণকালেও ঐ মধু ব্যবহার করিবে না।

সুতরাং মনের খাহেশ ও কামনা-বাসনা দূর করার উত্তম উপায় হইল, উপস্থিত লাভ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভবিষ্যতের ভয়াবহ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মানুষ যদি রিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয় এবং এই কথা জানিতে পারে যে, রিয়াকার দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কোনরূপ তাওফীক পাইবে না এবং আখেরাতেও আল্লাহর নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হইবে, রোজ কেয়ামতে তাহাকে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে, আল্লাহ পাক তাহার প্রতি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইবেন এবং হাশরের দিন সমস্ত মানুষের সম্মুখে তাহাকে অপমান করা হইবে, তাহাকে এই কথা বলিয়া লজ্জা দেওয়া হইবে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ ক্রয় করিতে তোমার কি একটুও লজ্জা হইল না? মানুষের নিকট ভাল হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর এবাদতের সঙ্গে উপহাস করিলে, তবে কি তুমি আল্লাহর আজাবের শিকার হইয়া মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার প্রত্যাশা করিতেছ? তুমি কি আল্লাহ হইতে দূর হইয়া মানুষের নৈকট্য লাভ করিতেছ এবং মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ? মানুষের সন্তুষ্টির জন্য তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি খরিদ করিতেছ?

অর্থাৎ বান্দা যখন এইভাবে নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিবে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকার ও আখেরাতের স্থায়ী ক্ষতির তুলনা করিয়া দেখিবে, তখন

আর সে রিয়ার প্রতি মনোযোগী হইতে পারিবে না। রিয়ার কারণে আমল বাতিল হইয়া যাওয়া কোন মামুলী ক্ষতি নহে। আখেরাতের হিসাব দিবসে একটি মাত্র নেকীর কারণেও আমলের পাল্লা ভারী হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং রিয়ার কারণে যদি একটি নেকীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে কি উহাকে সামান্য ক্ষতি মনে করা হইবে?

উপরে রিয়ার দ্বীনী ক্ষতির কথা আলোচনা করা হইল। রিয়ার পার্থিব ক্ষতিও কোন কম নহে। আসলে রিয়া করা হয় মানুষকে তুষ্ট করার জন্যে। কিন্তু মানুষকে তুষ্ট করার এই প্রক্রিয়াটি সকল ক্ষেত্রেই সফল হয় না। উহা বরং পেরেশানীরই কারণ হয়। কোন ক্ষেত্রেই উহা মানুষের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনে না। মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন এমনই এক দূরতিক্রম্য পথ যে, উহার শেষ অবধি পৌঁছা সহজসাধ্য নহে। মনে কর, তোমার কোন আমল দ্বারা যদি এক ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়, তবে অপর কেহ হয়ত উহা দ্বারা অসন্তুষ্ট হইবে। অর্থাৎ কতক ব্যক্তিকে অসন্তুষ্ট করিয়াই হয়ত অপর কতক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে। মানুষকে সন্তুষ্টকারী আমলটি হয়ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে। তো যেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ পাক তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তাহার উপর অসন্তুষ্ট করিয়া দেন। সুতরাং উহার পরও মানুষের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা দ্বারা কি লাভ অর্জিত হয়, তাহা বোধগম্য নহে। কেননা, মানুষের প্রশংসা ও সন্তুষ্টির কারণে তো হায়াত, দৌলত, রিজিক– ইত্যাদির কিছুই বৃদ্ধি ঘটিবে না।

মানুষের পক্ষ হইতে ধন-সম্পদ লাভের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এই কথা ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে, সকল মানুষের অন্তরই আল্লাহ পাকের আয়ত্বে। তিনি কাহাকেও কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করিলে মানুষের অন্তরকে তাহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া দিবেন এবং ইচ্ছা না করিলে তাহার অন্তরকে ফিরাইয়া রাখিবেন। গোটা মাখলুকাত তাহার ইচ্ছার অধীন এবং তিনিই কেবল মানুষের হায়াত-মউত ও রিজিক দেওয়ার মালিক। যেই ব্যক্তি মানুষের পক্ষ হইতে রিজিক পাওয়ার আশা করিবে, সে নিজেকে অপমান ও জিল্লতী হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। মানুষের পক্ষ হইতে যদি কুত্রাপি কিছু হাসিল হয়ও, তবুও মানুষের অনুগ্রহ ও করুণার অপমান তাহাকে অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। আর মানুষের পক্ষ হইতে মানুষের সকল চাহিদা পূর্ণ হওয়া, ইহা এক প্রকার অসম্ভবই বটে। উপস্থিত এই চাহিদা পূর্ণ হইলেও এই পূর্ণতার কারণে যেই পরিমাণ শান্তি হাসিল হইবে, তদাপেক্ষা অধিক অশান্তি ও জিল্লতী ভোগ করিতে হইবে মানুষের অনুগ্রহ লাভের কারণে।

বস্তুতঃ মানুষের নিন্দাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, মানুষের

নিন্দার কারণে তোমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটিবে না। তোমার তাকদীরে যাহা নির্ধারণ আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। মানুষের নিন্দার কারণে তোমার হায়াত হ্রাস করা হইবে না এবং তোমার রিজিকও কমিবে না। তুমি যদি জান্নাতী হও, তবে নিছক মানুষের নিন্দার কারণেই তোমাকে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে না। তুমি যদি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হও, তবে মানুষের সাধ্য কি তোমাকে আল্লাহর ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে? আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। সর্বাবস্থায় মানুষ তাহার অধীন। মানুষ মানুষের লাভ-লোকসান কিছুই করিতে পারে না এবং মানুষের হায়াত-মউতও অপর কোন মানুষের করায়ত্বে নহে। আর মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে মানুষের হাত থাকার তো কোন প্রশ্নই আসে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا *

অর্থঃ “এবং নিজেদের ভালও করিতে পারে না, মন্দও করিতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তাহারা মালিক নহে।” (সূরা আল ফোরকানঃ আয়াত ৩)

মানুষ যদি এইভাবে নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে রিয়ার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা, আকলমন্দ ও বুদ্ধিমান লোকেরা কখনো এমন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না যাহা মানুষের জন্য অধিক ক্ষতিকারক ও কম উপকারী হয়। আর মানুষ যদি রিয়াকারের আভ্যন্তরীন অবস্থা জানিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি মনে মনে রিয়া করে এবং মুখে এখলাস ও আন্তরিকতা জাহির করে, তবে এই অবস্তায় অবশ্যই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকিবে। আর এই কথাও সত্য যে, আল্লাহ পাক কোন না কোন সময় অবশ্যই রিয়াকারের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিবেন যেন মানুষ তাহার মনের রিয়া এবং আল্লাহর দরবারে তাহার মূল্যহীনতার কথা জানিতে পারে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে মানুষের কেবল রিয়ার অবস্থাই প্রকাশ করা হয় না। বরং তাহার এখলাস ও অন্তরিকতার অবস্থাও প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়। আর এই এখলাসের কারণেই আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মানুষের নিকট প্রিয় বানাইয়া দেন। অতঃপর মানুষের মুখে মুখে তাহার প্রশংসা হইতে থাকে। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তিও যেমন কোন কৃতিত্বের বিষয় নহে, তদ্রূপ মানুষের নিন্দাও দোষের নহে। এমন নহে যে, মানুষের নিন্দার কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

একদা বনু তামীমের এক কবি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিয়া এই দাবী করিল যে,

ان مدحى زين و ان قدحي شين

অর্থাৎ– “আমার প্রশংসা মানুষের সৌন্দর্যের উপকরণ এবং আমার নিন্দা মানুষের জন্য অভিশাপ।”

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাহার দাবী খণ্ডন করিয়া বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। এই গুণ এবং এই ক্ষমতা তো কেবল আল্লাহ পাকের জন্য সংরক্ষিত, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা মানুষের জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ এবং তাঁহার নিন্দা মানুষের জন্য অভিশাপ।

মানুষের প্রশংসা ও নিন্দায় কিছু আসে যায় না। আল্লাহ পাকের নিকট যদি তুমি নিন্দিত হও এবং তোমার ভাগ্যে জাহান্নাম নির্ধারিত থাকে, তবে মানুষের প্রশংসায় তোমার কোন কল্যাণ হইবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের নিকট যদি তুমি প্রিয় হও এবং জান্নাত তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে মানুষের নিন্দায় তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

যেই ব্যক্তি আখেরাতের জীবন এবং আখেরাতের অন্তহীন নেয়ামতের কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি পার্থিব জীবনের কদর্যতা ও দুনিয়ার তুচ্ছ নাজ-নেয়ামতকে একেবারেই মূল্যহীন মনে করিবে। এবং নিজেব দিল-দেমাগ ও চিন্তা-চেতনাকে সর্বতোভাবে আল্লাহমুখী করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ ব্যক্তি রিয়া ও মানুষের অনিষ্ট সাধন হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। অতঃপর তাহার এখলাস ও আন্তরিকতার নূর তাহার অন্তরকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে এবং তাহার অন্তর-চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সহিত তাহার সম্পর্ক আরো নিবিড় হইয়া বান্দার সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের আজমত তাহার অন্তরে বৃদ্ধি পাইবে। এই পর্যায়ে তাহার অন্তরে মাখলুকের জন্য আর কোন স্থানই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং তাহার অন্তরে রিয়ার কল্পনাও উদয় হইবে না।

রিয়ার শিক্ষাগত চিকিৎসা

রিয়ার শিক্ষাগত চিকিৎসা হইল, নিজের এবাদত সমূহ গোপন রাখার অভ্যাস গড়িয়া তোলা। অর্থাৎ নিজের আমল-এবাদত এমনভাবে গোপন রাখিবে, যেমন গোনাহের কর্মসমূহ গোপন রাখা হয়। তোমার অন্তর যেন এই কথার উপরই তুষ্ট থাকে যে, তোমার এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত এবং তোমার মন যেন গায়রুল্লাহর অবগতির প্রয়োজন অনুভব না করে।

কথিত আছে যে, একবার হযরত আবু হাফস (রহঃ) এর এক বন্ধু দুনিয়া

ও দুনিয়াদারদের নিন্দা করিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বলিলেন, তুমি এমন কথা প্রকাশ করিয়াছ যাহা গোপন রাখা দরকার ছিল। ভবিষ্যতে আর কোন দিন তুমি আমার নিকট বসিবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, হযরত আবু হাফস (রহঃ) দুনিয়ার নিন্দা সংক্রান্ত একটি সামান্য কথা বলিতেই কত কঠোর ভাষায় তাহাকে বারণ করিয়াছেন। উহার কারণ হইল, দুনিয়ার নিন্দার দাবী করা যেন নিজের তাকওয়া ও বুজুর্গী জাহির করারই নামান্তর। বস্তুতঃ রিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে "গোপনীয়তা অবলম্বন" অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর কিছু নাই। এই ক্ষেত্রে আত্মসংযম ও মোজাহাদার প্রাথমিক অবস্থায় নিজের এবাদত গোপন রাখার আমলটি অতীব দুরূহ মনে হইবে বটে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় কিছু দিন তাহা কষ্টকর হইলেও আল্লাহর রহমতে পরে তাহা ক্রমে সহজ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ যাহারা আমল ও চেষ্টায় নিরত থাকিবে, তাহারা উহার ফল পাইবে। আর অকর্মন্য ও বেআমল লোকেরা কিছুই পাইবে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ =

অর্থঃ "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যেই পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রা'দঃ আয়াত- ১১)

বান্দা যখন মেহনত ও মোজাহাদা করে, তখন আল্লাহ পাক হেদায়েত দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। বান্দা করাঘাত করিলে আল্লাহ পাক রহমতের দরজা খুলিয়া দেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ =

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।"

(সূরা তওবাঃ আয়াত ১২০)

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ রিয়ার অনিষ্ট দমন করা

অর্থাৎ এবাদতের সময় যেই সমস্ত ওয়াসওয়াসা ও আপদ অন্তরে উদয় হইয়া অন্তরকে গায়রুল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করিয়া দেয়, সেইসব বিষয়গুলি দমন করা। উহা দমন করার পদ্ধতি সকলেরই জানা থাকা আবশ্যক। যাহারা নিজের নফসের সঙ্গে জেহাদ করে, তাহারা অল্পেতুষ্টি, লোভ-লালসা বর্জন, মানুষের নজরে নিজেকে হীন করিয়া তোলা এবং মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি বেপরওয়া হওয়া ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে অন্তর হইতে রিয়ার শিকড় উৎপাটন করিয়া ফেলে। অবশ্য শয়তানতো তাহাদের পিছনে লাগিয়াই থাকে। সে বরং রিয়ার আপদ-উপাদান দ্বারা মানুষকে অনুক্ষণ পেরেশান করিয়া রাখে। তো রিয়ার এইসব অবস্থা এবং ওয়াসওয়াসা ও নফসের খাহেশাত অন্তর হইতে

পরিপূর্ণরূপে দূর হয় না। বরং মোজাহাদা দ্বারা উহা দমন হইয়া থাকে। পরে রিয়ার বাহ্যিক কোন উপসর্গের স্পর্শ পাইলে পুনরায় উহা মাথাচাড়া দিয়া উঠে। এই কারণেই রিয়ার বিপদাপদ এবং উহার উপসর্গ দূর করার পদ্ধতি জানা এবং সেই অনুযায়ী চেষ্টা করা জরুরী।

রিয়ার বিপদাপদ

রিয়ার বিপদ তিনটি। কোন কোন সময় এই তিনটি বিপদ একই সঙ্গে আসিয়া হাজির হয়, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহাকে একটি বিপদ বলিয়াই মনে হয়। আবার কোন কোন সময় এই তিনটি বিপদ পর্যায়ক্রমে একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হয়। রিয়ার প্রথম বিপদ হইল– নিজের এবাদত সম্পর্কে মানুষের অবগতি এবং এই অবগতি সম্পর্কে নিজে জ্ঞাত হওয়ার বাসনা। দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রশংসা ও তারীফ এবং মানুষের নিকট মর্যাদা লাভের বাসনা অন্তরে পয়দা হওয়া। তৃতীয়তঃ নফ্স সেই অবস্থাটিকে কবুল করা এবং উহার স্থিতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

উপরোক্ত প্রথম অবস্থাটির নাম মারেফাত এবং দ্বিতীয়টির নাম হালাত। ইহাকে শাহওয়াত ও রগবতও বলা যাইতে পারে। আর তৃতীয়টির নাম হইল ইচ্ছা। আলোচ্য প্রথম বিপদটি দমনের জন্য পর্যাপ্ত শক্তির প্রয়োজন, যেন পরবর্তী দুইটি বিপদ আসিবার কোন সুযোগই না পায় এবং উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। সুতরাং কাহারো অন্তরে যদি রিয়ার প্রথম বিপদ তথা নিজের এবাদত সম্পর্কে অপরাপর মানুষের অবগতি এবং তাহাদের অবগতি সম্পর্কে নিজে জ্ঞাত হওয়ার অবস্থা পাওয়া যায়, তবে নিজের মনকে এই কথা বলিয়া উহা দূর করার চেষ্টা করিবে যে, মানুষের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? মানুষ তোমার এবাদত সম্পর্কে জানুক বা নাজানুক– তাহাদের জানা নাজানার উপর তো তোমার এবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে না। আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ এবং তিনি সকল কিছু জানেন। বান্দার এবাদত কবুল করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন। এই ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর কোন হাত নাই এবং তাহাদের অবগতিতে কোন ফায়দাও নাই। তোমার অন্তরে যদি মানুষের হামদ ও প্রশংসার খাহেশ পয়দা হয়, তবে রিয়ার অনিষ্ট ও বিপদসমূহের কথা স্মরণ করিয়া অন্তর হইতে উহা দূর করার চেষ্টা করিবে। মনে মনে চিন্তা করিবে, আমি যদি এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত এবাদত না করি, তবে আমাকে রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাকের ক্রোধ ও গজবের শিকার হইতে হইবে। আর এমন কঠিন সময়ে ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে যখন এই ছাওয়াব ব্যতীত রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় থাকিবে না। "মানুষ আমার এবাদত সম্পর্কে অবগত হইয়াছে" এই কথা জানার কারণে যেমন অন্তরে রিয়ার প্রতি আগ্রহ পয়দা হয়,

তদ্রূপ রিয়ার অনিষ্ট এবং উহার বিপদের কথা স্মরণ করিলেও রিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

রিয়ার অনিষ্ট দমন

রিয়ার বিপদাপদ এবং উহার অনিষ্ট দূর করার জন্য তিনটি বিষয় জরুরী। সেই তিনটি বিষয় হইল– মারেফাত বা রিয়ার পরিচয় ঘৃণা এবং অস্বীকৃতি। মানুষ অনেক সময় পাক্কা এরাদা করিয়া এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত এবাদত শুরু করে। পরে রিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং সে উহাকে গ্রহণও করিয়া লয়। এই সময় রিয়ার পরিচয় এবং উহার প্রতি তাহার ঘৃণার কথা স্মরণ থাকে না– যাহা ইতিপূর্বে তাহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। উহার কারণ হইল– নিন্দার ভয় ও প্রশংসাপ্রীতি। অর্থাৎ এই সময় রিয়া বা প্রশংসাপ্রীতি মনের উপর এমন প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া বসে যে, উহার ফলে তখন মনে অন্য কিছু স্থান পায় না এবং রিয়ার অনিষ্টকর পরিণতির কথা যাহা ইতিপূর্বে অন্তরে বিদ্যমান ছিল তাহা রিয়ার নিকট পরাভূত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তাহা মন হইতে বাহির হইয়া যায় এবং এই সুযোগে রিয়া মনের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়।

উপরের অবস্থাটির উদাহরণ যেন এইরূপঃ এক ব্যক্তি হয়ত অতীব যত্নের সহিত মনে সহনশীলতা লালন করিতেছে এবং সে ক্রোধকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। সে দৃঢ়তার সহিত এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়া রাখিয়াছে যে, আমার সম্মুখে ক্রোধের উপসর্গ উপস্থিত হইলেও আমি পরিপূর্ণভাবেই সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করিব। কিন্তু পরে যখন ক্রোধের কোন কারণ আসিয়া হাজির হইল, তখন তাহার অন্তরে সহসা ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং মনের সেই প্রতিজ্ঞার কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল। মনের কামনা-বাসনা, খাহেশাতের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ খাহেশাতের সিক্ততায় যখন মন ভরিয়া উঠে, তখন মারেফাতের নূর নির্বাপিত হইয়া যায়।

হযরত জাবের (রাঃ) এক বর্ণনায় উপরোক্ত অবস্থাটির হাকীকত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা বৃক্ষের নীচে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে বাইআত করিয়াছিলাম যে, আমরা জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিব না, মৃত্যুর উপর বাইআত করি নাই। কিন্তু হোনাঈনের যুদ্ধের সময় আমরা সেই বাইআতের কথা ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নোদ্যত হইলাম। পরে যখন এই কথা বলিয়া আওয়াজ দেওয়া হইল– হে (বৃক্ষের নীচে) বাইআত গ্রহণকারীগণ! তখন আমরা পুনরায় ময়দানে ফিরিয়া আসিলাম। (মুসলিম শরীফ)

বাইআত গ্রহণ করার পরও যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করার কারণ

হইল, তাহাদের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং ময়দানে জমিয়া থাকার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। পরে সেই বাইআতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা পুনরায় ময়দানে ফিরিয়া আসেন।

তো মনের এইসব আবেগ ও কামনা-বাসনা সহসাই উত্তেজিত হয়। অর্থাৎ এইসব আবেগ ও কামনার ফলে যে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তাহা স্মরণ থাকে না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, রিয়ার পরিচয় ও মারেফাত যদি অন্তরে বিদ্যমান না থাকে, তবে অন্তরে রিয়ার প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ পাইবে না। কেননা, এই ঘৃণা তো মারেফাতের কারণেই সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ রিয়াতে লিপ্ত থাকে এবং সে এই কথাও জানে যে, তাহার অন্তর যেই অনিষ্টের শিকার হইয়াছে তাহা রিয়ার অনিষ্ট যাহা আল্লাহর আজাবের শিকার হওয়ার কারণ হইবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রিয়ার প্রতি মনের আকর্ষণ এমনই প্রবল হয় যে, রিয়ার পরিচয় ও মারেফাতের পরও উহাতে লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে নফসের খাহেশাত তাহার বুদ্ধি-বিবেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপস্থিত সুখ সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। এই সময় সে "ভবিষ্যতে তওবা করিয়া লইবে" এইরূপ প্রবোধ দ্বারা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়া রাখে। কিংবা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে, যাহার ফলে রিয়া হইতে প্রাপ্ত উপস্থিত সুখের অনিষ্টের কথা তলাইয়া দেখারও সুযোগ পায় না।

এমন অনেক আলেম আছেন যাহাদের সকল কর্মের সহিতই রিয়ার সংমিশ্রণ থাকে। অথচ তাহারা রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত। কিন্তু তবুও রিয়া হইতে পরহেজ করিতে পারেন না। বরং ক্রমাগতভাবে রিয়া করিতেই থাকেন। তাহাদের এই "বারংবার কর্ম" তাহাদের বিরুদ্ধে বিরাট দলীল হইবে। কেননা, তাহাদের মধ্যে রিয়ার অনিষ্টের এলেম থাকা সত্ত্বেও তাহারা রিয়া করিতেছেন। এই কারণেই বলা হয়, কেবল মারেফাত বা রিয়ার অনিষ্ট বিষয়ে জানা থাকিলেই চলিবে না। বরং এই মারেফাতের পাশাপাশি রিয়ার প্রতি ঘৃণাও থাকিতে হইবে। আবার অনেক সময় রিয়া মারেফাত এবং উহার প্রতি ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও মানুষ রিয়াতে জড়াইয়া পড়ে। উহার কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নফসের খাহেশাতের শক্তির তুলনায় রিয়ার প্রতি ঘৃণার শক্তিটি অনেক দুর্বল থাকে। অর্থাৎ রিয়ার প্রতি ঘৃণার এইরূপ দুর্বল শক্তি খাহেশাতের প্রবল শক্তির সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে না। এই কারণেই মারেফাত ও ঘৃণার উপস্থিতির পরও সে রিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ঘৃণা এমন শক্তিশালী হইতে হইবে যেন উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রিয়া হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে। তবে শুধু ঘৃণা থাকিলেও চলিবে না। রিয়ার মা'রেফাতও থাকিতে হইবে। অর্থাৎ এই বিষয়ে শেষ কথা হইল– রিয়ার মারেফাত, রিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং রিয়া করিতে অস্বীকৃতি– এই তিনটি উপাদান এক যোগে

বিদ্যমান থাকিলেই রিয়া হইতে নিরাপদ থাকা যাইবে।

রিয়ার প্রতি অস্বীকৃতি হইল ঘৃণার ফসল এবং ঘৃণা হইল মারেফাতের ফসল। তো মানুষের ঈমান ও আমলের নূর যেই পরিমাণ শক্তিশালী হইবে, মারেফাতও সেই পরিমাণই শক্তিশালী হইবে। অনুরূপভাবে মানুষ দুনিয়াকে যেই পরিমাণ মোহাব্বত করিবে, আখেরাতের প্রতি সেই পরিমাণ গাফেল হইবে। আর আল্লাহ পাকের এনাম ও পুরস্কার হইতে যেই পরিমাণ মুখ ফিরাইয়া রাখিবে এবং পারলৌকিক জীবনের নাজ-নেয়ামতকে যেই পরিমাণ উপেক্ষা করিবে; তাহার মারেফাতও সেই পরিমাণেই দুর্বল হইবে। ইহা এমন এক ক্রমধারা যে, ইহার একটি কড়া অপরটির সহিত জড়িত এবং একটি অপরটির ফসল। আর এই সবের মূল হইল দুনিয়ার মোহাব্বত ও খাহেশাতের প্রাবল্য। আর ইহাই হইল যাবতীয় পাপাচারের ভিত্তি। কেননা, সুনাম-সুখ্যাতি ও পার্থিব ইজ্জত-সম্পদের মোহই মানুষের মনকে দ্বীন হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া মানুষের ঈমানী শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। এই পর্যায়ে মানুষ দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগে এমন ভাবে মাতিয়া উঠে যে, অতঃপর আর সে আখেরাতের কথা ভাবিয়া দেখিবারও সুযোগ পায় না।

ওয়াসওয়াসার কারণে শাস্তি দেওয়া হইবে না

মনে কর এক ব্যক্তি রিয়াকে খারাপ মনে করে এবং এই খারাপ মনে করার কারণেই কখনো সে রিয়া করে না, বরং সর্বদা রিয়া বর্জন করিয়া চলে। কিন্তু তবুও তাহার মন রিয়ার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অবশ্য রিয়ার প্রতি মনের এই আকর্ষণকেও সে খারাপ মনে করে। এখন এই ব্যক্তি রিয়াকারদের মধ্যে গণ্য হইবে কিনা।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে প্রথম কথা হইল, আল্লাহ পাক কাহাকেও উহার শক্তির অতিরিক্ত কোন কাজের নির্দেশ দেন নাই। অর্থাৎ মানুষকে এমন কোন কর্মের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় নাই, যাহা তাহার শক্তি ও ক্ষমতার বাহিরে। শয়তানকে ওয়াসওয়াসা দেওয়া হইতে বারণ করা এবং মনকে কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে না দেওয়া, ইহা মানব-ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম। মানুষের দায়িত্ব হইল, নিজের কামনা-বাসনা ও খাহেশাতকে মনের সেই ঘৃণা দ্বারা মোকাবেলা করা যাহা সে ঈমান-এলেম ও মারেফাত দ্বারা হাসিল করিয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি এইরূপ করিতে পারে, তবে মনে করা হইবে, সে যেন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছে। নিম্নের বিবরণ এই বক্তব্যের দলীল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একবার কতক ছাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজেদের অবস্থার বিবরণ দিয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মনে অনেক সময় এমন

এমন খেয়াল পয়দা হয় যে, আমরা উহা মুখে প্রকাশ করিতে পারিব না। সেইসব খেয়ালকে ভাষায় রূপ দেওয়া অপেক্ষা ইহা উত্তম হইবে যে, আমাদিগকে যেন আকাশ হইতে নিক্ষেপ করা হয় বা কোন পাখী আমাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যায় কিংবা ঝড়ো হাওয়া যেন আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া দূরে কোথাও নিয়া নিক্ষেপ করে।

ছাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত বক্তব্য শুনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি সেইসব খেয়ালকে খারাপও মনে কর? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হাঁ! আমরা উহাকে খারাপ মনে করি বটে। তিনি এরশাদ করিলেনঃ তবে তো ইহা সুস্পষ্ট ঈমান।

(মুসলিম শরীফ)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, ছাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ওয়াসওয়াসা এবং উহার প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান ছিল। এখন ইহা তো কোনক্রমেই সম্ভব নহে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের মনের ওয়াসওয়াসাকে ঈমান বলিবেন। সুতরাং এই কথা মানিতেই হইবে যে, তিনি ছাহাবায়ে কেরামের মনের সেই ঘৃণাকেই পরিষ্কার ঈমান বলিয়াছেন যাহা তাহাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসার পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। রিয়া যদিও নিন্দনীয় কিন্তু উহা আল্লাহর ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা করা অপেক্ষা কম নিন্দনীয়। তো ওয়াসওয়াসার প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করার কারণেই যদি উহার অনিষ্ট দূর হইয়া যায়, তবে তো এই ঘৃণার কারণে রিয়ার অনিষ্ট আরো উত্তম রূপেই দূর হইবে।

আবু হাজিব (রহ) বলেন, যেই অনিষ্টকে তোমার অন্তর খারাপ মনে করে এবং উহা যদি শত্রুর পক্ষ হইতে আগত হয়, তবে তোমার জন্য তাহা ক্ষতিকারক নহে। আর যেই অনিষ্টের উপর তোমার অন্তর সন্তুষ্ট, উহা তোমার জন্য ক্ষতিকর। এই বিষয়ে তুমি স্বীয় নফসকে তিরস্কার করা উচিৎ। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে যদি নফস খারাপ মনে করে তবে এমতাবস্থায় উহা আর মানুষের জন্য ক্ষতিকর থাকে না। তবে শর্ত হইল, শয়তান ও নফস যেন ঘৃণা ও অস্বীকৃতির উপর প্রবল হইতে না পারে। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– এমনসব উপকরণ যেইগুলির আলোচনা ও স্মরণ দ্বারা রিয়ার উদ্ভব ঘটে, উহা শয়তানের পক্ষ হইতেই হয়। আর রিয়ার সেইসব উপকরণের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া ইহা নফসের কর্ম। একইভাবে রিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ– ইহা ঈমান ও আকলের ফসল।

এই পর্যায়ে শয়তান মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেই জাল বিস্তার করে উহা হইল– শয়তান যখন দেখিতে পায় যে, আবেদ রিয়া করিতে অস্বীকার করিতেছে এবং কোনক্রমেই সে আবেদকে রিয়ায় জড়াইতে পারিতেছে না,

তখন সে আবেদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, শয়তান তোমাকে যেই কুমন্ত্রণা দিবে তুমি উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। অর্থাৎ এইভাবেই সে আবেদকে শয়তানের সহিত এক দীর্ঘসূত্রী বিবাদে লিপ্ত করিয়া তাহাকে এবাদত ও প্রার্থনা হইতে বঞ্চিত রাখার কৌশল অবলম্বন করে। ইহা শয়তানের এক সূক্ষ্ম চাল। কেননা, শয়তানের সঙ্গে বিবাদে জড়াইয়া এবাদত হইতে বঞ্চিত থাকা আবেদের জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

রিয়া হইতে আত্মরক্ষাকারীদের স্তর

যাহারা রিয়ার অনিষ্ট দমন করিয়া উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহে, তাহারা চারিস্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর

প্রথমতঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা রিয়ার অনিষ্ট সমূহ শয়তানের দিকেই ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে মিথ্যুক প্রতিপাদন করে। শয়তানকে কেবল মিথ্যুক বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বরং তাহার সঙ্গে এই বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। আর এই বিবাদকে এই মনে করিয়া দীর্ঘায়িত করে যে, তাহাদের ধারণায় শয়তানের সঙ্গে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত থাকিলেই আত্মা নিরাপদ থাকিবে। আসলে এই ধারণা সঠিক নহে এবং ইহাতে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোন অংশ নাই। কেননা, শয়তানের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রী বিবাদে লিপ্ত হওয়ার ফলে আবেদ আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় এবং এইভাবে সময় নষ্ট করার ফলে এমনসব কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকে যাহা হাসিল করা তাহার নিজের জন্য আবশ্যক ছিল।

কোন মুসাফির যদি পথে চোর-ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে বিলম্ব ঘটিবে। এমনও হইতে পারে যে, পথে এইভাবে বিবাদে জড়াইয়া থাকার ফলে হয়ত নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতেই পারিবে না। সুতরাং মুসাফিরের কর্তব্য হইতেছে, পথে চোর-ডাকাতদের সঙ্গে কোন রূপ বিবাদে না জড়ানো এবং যথাসম্ভব তাহাদিগকে এড়াইয়া নিজের গন্তব্যে পৌঁছিয়া যাওয়া।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা কোনরূপ হানাহানী ও সংঘর্ষকে সাধনার পথে ক্ষতিকর মনে করে। এই কারণে তাহারা শয়তানকে কেবল মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া এবং তাহার কুমন্ত্রণার প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে কোন রূপ বিরাদে লিপ্ত হইয়া নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে না।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয়তঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতিবাদ এবং তাহাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার কাজেও লিপ্ত হয় না। কেননা, ইহাও একটি বিঘ্ন বটে এবং এই বিঘ্নের ফলে স্বল্প মাত্রায় হইলেও নিজেদের কাজের ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহারা রিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং শয়তানকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার কাজটি নিজেদের অন্তরেই গোপন রাখিয়া কর্তব্যকাজে লিপ্ত থাকে।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থতঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা মনে করে, রিয়ার উপকরণ সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করিলে শয়তান আমাদের সঙ্গে হিংসা করিবে এবং আমাদের পিছনে লাগিয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লয় যে, শয়তান আমাদের সঙ্গে যত শত্রুতাই করুক, আমরা এখলাসের সহিত আমাদের এবাদতে লিপ্ত থাকিব। আমরা গোপনে দান-খয়রাত করিব এবং গোপনেই এবাদত-বন্দেগী করিতে থাকিব। যেন উহা দেখিয়া শয়তান নিজের ক্রোধের আগুনে জ্বলিয়া ছারখার হইতে থাকে। আমাদের এইরূপ এখলাসপূর্ণ আমল শয়তানকে নিরাশ করিয়া দিবে এবং বাধ্য হইয়া সে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

একবার হযরত ফোজায়েল ইবনে যাওয়ানের নিকট কেহ আসিয়া বলিল, অমুক ব্যক্তি আপনার নিন্দা করিয়াছে। হযরত ফোজায়েল সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিলেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে জ্বালাইয়া দিব যেই ব্যক্তি আমার নিন্দাকারীকে এই গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যক্তিকে কে এই গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে আর আপনি কাহাকেইবা আগুনে জ্বালাইবেন? হযরত ফোজায়েল বলিলেন, আমি শয়তানকে জ্বালাইব; শয়তানই ঐ ব্যক্তিকে এই গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির জন্য এইরূপ দোয়া করিলেন– আয় আল্লাহ! যেই ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়াছে, তাহাকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও। দোয়া শেষে তিনি বলিলেন, আমার এই দোয়ার কারণে শয়তানের গায়ে আগুন জ্বলিয়া গিয়াছে। শয়তান যখন মানুষকে এইরূপ করিতে দেখে, তখন সে ঐ ব্যক্তির এবাদত বৃদ্ধির কারণ হওয়ার আশংকায় তাহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, শয়তান মানুষকে গোনাহের কাজে আহবান করে। কিন্তু মানুষ যদি শয়তানের এই আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া নেক আমলে মশগুল হইয়া যায়, তবে শয়তান আর তাহার নিকটেও ঘেঁষিতে পারে না। হযরত তাইমী আরো বলিয়াছেন, তুমি যখন কোন কাজে দোদুল্যমান অবস্থায় থাক, তখন শয়তান তোমাকে দেখিয়া আনন্দ পায়। পক্ষান্তরে শয়তান

তোমাকে যখন কোন কাজে স্থির দেখে, তখন সে নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়।

আলোচ্য স্তর সমূহের উদাহরণ

হারাস মুহাসাবী উপরোক্ত চারি স্তরের লোকদের একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মনে কর, চার ব্যক্তি হেদায়েত, বরকত ও ফজিলত হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন দরসে কোরআনে যোগদান করিতে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে কোন গোমরাহ বেদআতী ঐ চার ব্যক্তিকে মাহফিলে যাইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, তাহারা যদি ঐ দ্বীনের মজলিসে গিয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া আসে, তবে আমি আর তাহাদিগকে গোমরাহ করিতে পারিব না। সুতরাং যে কোন উপায়ে তাহাদের গতিরোধ করা আবশ্যক। অতঃপর সে আগাইয়া গিয়া এক জনের সঙ্গে কথা বলিল। অতি কৌশলে সে তাহাকে ঐ মজলিসে না গিয়া গোমরাহীর পথে চলার দাওয়াত দিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি লোকটির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে মনে করিল, এখন দ্বীনের মাহফিলে না গিয়া এই বেদআতীর ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন করা অধিক জরুরী।

এদিকে বেদআতী লোকটির উদ্দেশ্যও এইরূপই ছিল যে, কোনক্রমে তাহাকে বিতর্কে জড়াইয়া রাখিতে পরিলেই সে দ্বীনের মজলিসের নূর হইতে বঞ্চিত হইবে। অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্যও যদি তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় তবুও দ্বীনের নূর হইতে সে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং ইহাও আমার জন্য কম সাফল্য নহে।

অতঃপর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহাকেও দ্বীনের মজলিসে যাইতে বাধা দিল এবং এই ব্যক্তিকেও বিতর্কে জড়াইতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যক্তি বেদআতীর সঙ্গে কোনরূপ বিতর্কে জড়াইল না এবং তাহাকে ধাক্কা দিয়া পথ হইতে সরাইয়া সামনে আগাইয়া গেল। কিন্তু বেদআতী এই সামান্য বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াও মনে মনে খুশী হইল যে, তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে ধাক্কা দিতে যেই সময় ব্যয় হইয়াছে, অন্ততঃ তাহার এই পরিমাণ সময়ও সে নষ্ট করিতে পারিয়াছে। ইহাও তো কোন অংশে কম নহে।

অতঃপর সে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহাকে ফিরাইতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যক্তি বেদআতীর কথায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সোজা মজলিসের দিকে চলিয়া গেল। অর্থাৎ এই তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেদআতীর আকাঙ্খা নিরাশায় পরিণত হইল।

অবশেষে চতুর্থ ব্যক্তির নিকট গিয়া সে একইভাবে তাহাকে বাধা দিতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যক্তি তাহার কথায় তো কান দিলই না, বরং উল্টা তাহাকে অপ্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পূর্বাধিক দ্রুত গতিতে হাঁটিয়া যথাসম্ভব অল্প সময়ের

মধ্যে মজলিসে পৌঁছাইবার প্রয়াস পাইল। অর্থাৎ বেদআতীর দাওয়াতের ফলে যেন তাহার নেক আমলে আরো গতি সঞ্চার হইল।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ঘটনাক্রমে কোন দিন যদি এই বেদআতী বর্ণিত চার ব্যক্তিকে একই সঙ্গে সেই মজলিসে যাইতে দেখে, তবে প্রথম পদক্ষেপেই সে ঐ তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিবে বটে, কিন্তু সেই চতুর্থ ব্যক্তির নিকটেও ঘেঁষিবে না। কেননা, এই ক্ষেত্রে সে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণেই এইরূপ আশংকা করিবে যে, আমি যদি তাহাকে গোমরাহীর পথে দাওয়াত দেই, তবে উহা বরং তাহার নেকী বৃদ্ধির কারণও ঘটিতে পারে।

শয়তান হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হইবে কি-না

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন, এমন কামেল স্তরের আবেদ জাহেদ যাহাদের আপাদমস্তক আল্লাহর মোহাব্বতের সাগরে নিমজ্জিত, তাহারা শয়তানের প্রতারণা হইতে নিরাপদ। বৃদ্ধ আবেদগণকে যেমন শরাব ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায় না, তদ্রূপ এই শ্রেণীর মজবুত আবেদগনকেও গোনাহের পথে আনা সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করা নিরর্থক।

আবার কেহ কেহ বলেন, শয়তানকে অবশ্যই ভয় করিতে হইবে। যাহাদের একীন ও তাওয়াক্কুল দুর্বল তাহারা শয়তানের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অপর এক দল বুজুর্গ বলেন, "এমন কামেল আরেফ যাহাদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহাব্বত নাই, তাহারা শয়তান হইতে নিরাপদ" এই উক্তি নিছক শয়তানের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, এইরূপ ধারণার ফলে ভয়ানক বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। আল্লাহর নবীগণই যখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যরা উহা হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে? তা ছাড়া শয়তান কেবল পার্থিব স্বাদ-সম্ভোগের ব্যাপারেই ওয়াসওয়াসা দেয় না; বরং সে আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের ব্যাপারেও সন্দেহের দরজা খুলিয়া দেয়। অনুরূপভাবে বিবিধ বেদআত ও গোমরাহীর ব্যাপারেও সে ওয়াসওয়াসা পয়দা করে। মোটকথা, কোন মানুষই শয়তানের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ =

অর্থঃ "আমি আপনার পূর্বে যেই সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা যখনই কোন কল্পনা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহাদের কল্পনায় কিছু

মিশ্রণ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করিয়া দেন শয়তান যাহা মিশ্রণ করে। ইহার পর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।"

(সূরা হজ্বঃ আয়াত ৫২)

আল্লাহর নবীগণও শয়তানের প্রতারণা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) জান্নাতে বসবাস করিতেছিলেন, যেখানে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অভাব ছিল না। আল্লাহ পাক তাঁহাদের নিকট এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে,

إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرٰى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحٰى *

অর্থঃ "এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বাহির করিয়া না দেয় তোমাদের জান্নাত হইতে। তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পতিত হইবে। তোমাকে এই দেওয়া হইল যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত হইবে না এবং বস্ত্রহীন হইবে না। এবং তোমার পিপাসাও হইবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাইবে না।"

(সূরা তোয়া হাঃ আয়াত ১১৭-১১৯)

হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে বেহেশতের সমস্ত নেয়মত ভোগ করার সুযোগ দিয়া শুধু একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া সেই বৃক্ষের ফল খাইতে উদ্বুদ্ধ করিল। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, একজন নবী বেহেশতে থাকিয়াও যদি শয়তানের প্রতারণার শিকার হইয়া থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে ফেৎনা-ফাসাদে ভরপুর এই বালা-মুসীবতের দুনিয়াতে থাকিয়া শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি নকল করিয়াছেন–

هذا من عمل الشيطن

অর্থঃ "ইহা শয়তানের কাজ।"

এই কারণেই আল্লাহ পাক সমস্ত মাখলুককে শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া ফরমাইয়াছেন–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ =

অর্থঃ "হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।"

(সুরা আল-আরাফঃ আয়াত ২৭)

শয়তান সম্পর্কে আরো বলা হইয়াছে–

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ =

অর্থঃ "সে এবং তাহার দলবল তোমাদিগকে দেখে, যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।" (সূরা আল-আরাফঃ ২৭)

পবিত্র কোরআনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকার এবং তাহাকে ভয় করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এমতাবস্থায় কোন্ ব্যক্তি এমন দাবী করিতে পারে যে, শয়তানের ব্যাপারে তাহার কোন ভয় নাই এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে সে নিরাপদ? আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শয়তান হইতে আত্মরক্ষা করা– আল্লাহর মোহব্বতে মশগুল হওয়ার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নহে। কেননা, আল্লাহর মোহাব্বতের কারণেই তো সে আল্লাহর হুকুম পালন করিতেছে। মানুষের চির শত্রু শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এমন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির সহিত মোকাবেলা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ

অর্থঃ "তাহারা যেন আত্মরক্ষার হাতিয়ার সঙ্গে নেয়।" (সূরা নিসাঃ আয়াত ১২০)

আরো এরশাদ হইয়াছে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ =

অর্থঃ "আর প্রস্তুত কর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য হইতে এবং পালিত ঘোড়া হইতে।"

(সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৬০)

ইহা দ্বারা প্রমাণ হইয়া গেল যে, এমন কাফের দুশমন যাহাকে তুমি দেখিতে পাও; তাহার অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকা যদি জরুরী হয়, তবে এমন দুশমনের অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকা আরো অধিক জরুরী হইবে– যাহাকে তুমি দেখিতে পাওনা কিন্তু সে তোমাকে দেখিতে পায়। কারণ, শত্রুকে তুমি দেখিতে পাওনা, কিন্তু শত্রু তোমাকে দেখিতে পায়– ইহা তোমার জন্য অত্যন্ত বিপদজনক।

মোহাম্মদ ইবনে মুহাইরিজ (রহঃ) বলেন, এমন শিকার তুমি সহজে কাবু করিতে পারিবে যাহাকে তুমি দেখিতে পাও কিন্তু সে তোমাকে দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে এমন শিকার তোমার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, যে তোমাকে দেখিতে পায় কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতে পাওনা। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের পক্ষে শয়তানকে কাবু করা সহজসাধ্য নহে। শয়তান মানুষের জন্য কাফের

শত্রুর চাইতেও অধিক ভয়ংকর। কেননা, তুমি যদি গাফেল অবস্থায় কাফেরের হাতে নিহত হও, তবে শাহাদাতের মর্যাদা পাইবে। পক্ষান্তরে গাফেল অবস্থায় শয়তান যদি তোমাকে গোমরাহ করে, তবে তোমাকে দোজখের কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে।

সারকথা হইল, আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকার জন্য ইহা জরুরী নহে যে, তিনি যাহাকে ভয় করিতে বলিয়াছেন এবং যাহার অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়াছেন তাহাকে ভয় করিতে হইবে না এবং তাহার অনিষ্ট হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে না। এমন মনে করিবারও কোন কারণ নাই যে, এই ক্ষেত্রে "শত্রু হইতে সতর্কতা অবলম্বন" আল্লাহর এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হইবে।

পার্থিব উপকরণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে

যাহারা বলে, "তদ্বির ও পার্থিব উপায়-উপকরণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী" তাহাদের এই ধারণা সঠিক নহে। তাহাদের জানা উচিৎ যে, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গণে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল ব্যবহার করিয়াছেন, সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং শত্রুর গতি রোধ করার জন্য পরিখা খনন করিয়াছেন। অর্থাৎ শত্রু পক্ষের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য তিনি এই ধরনের আরো অনেক রণকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার এইসব কৌশল ও পার্থিব উপায়-উপকরণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ছিল? স্বয়ং আল্লাহ পাক যেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কখনো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হইতে পারে না। যাহারা মনে করে– তাওয়াক্কুলের অর্থ হইতেছে, "যাবতীয় উপায়-উপকরণ বর্জন" তাহারা মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিপতিত। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل (আর প্রস্তুত কর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য হইতে এবং পালিত ঘোড়া হইতে)– ইহা কখনো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে। তবে শর্ত হইল, মনে এইরূপ বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, লাভ-ক্ষতি, হেদায়েত ও গোমরাহী ইত্যাদি সবই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও চেষ্টা-তদ্বির কেবল উসিলামাত্র। অন্যথায় আল্লাহ পাক যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে।

শয়তান হইতে সতর্ক হওয়ার পদ্ধতি

শয়তান হইতে আত্মরক্ষা করা ও সতর্ক হওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে কি-না,

এই বিষয়ে উপরে একাধিক মতামত উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা মনে করেন, শয়তান হইতে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে যে, ঐ ব্যবস্থার ধরণ ও প্রক্রিয়া কি হইবে? এই শ্রেণীটির কতক লোক মনে করেন, আল্লাহ পাক যেহেতু আমাদিগকে শয়তানকে ভয় করিতে বলিয়াছেন, সেহেতু আমাদের অন্তরে শয়তানের ভয় এবং শয়তানের কথা স্মরণ রাখা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের অন্তরে প্রবল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। শয়তানের ব্যাপারে যদি আমরা এক মুহূর্তও গাফেল হই, তবে সে আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

আবার কতক লোক মনে করেন, অনুক্ষণ শয়তানের ভয় এবং তাহার খেয়াল আমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিবে। আর শয়তানেরও লক্ষ্য হইল, যে কোন কৌশলেই হউক বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিলেই হইল। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, সর্বদা আল্লাহর এবাদত-আনুগত্য ও তাঁহার স্মরণে নিমগ্ন থাকা এবং শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত ও জিকিরের পাশাপাশি শয়তানের প্রতারণার কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। বরং সর্বদাই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। তবে এমন যেন না হয় যে, শয়তানের ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল হইয়া যাই। অর্থাৎ শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক খেয়াল এবং আল্লাহর স্মরণ– এই দুইটি অবস্থা একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকিতে হইবে। কেননা, আমরা যদি শয়তানের কথা ভুলিয়া থাকি, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই সুযোগে শয়তান আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে। অনুরূপভাবে যদি শয়তানের প্রতারণা হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে সর্বদা শয়তানের খেয়াল করিয়া বসিয়া থাকি, তবে উহার ফলে আমরা আল্লাহর স্মরণ হইতে বঞ্চিত হইব। এই কারণেই শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতা এবং আল্লাহর জিকির ও স্মরণ– এই দুইটি বিষয় একই সঙ্গে বিদ্যমান হওয়া জরুরী।

শয়তানের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কি উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে, এই প্রসঙ্গে উপরে দুইটি শ্রেণীর মতামত উল্লেখ করা হইল। কিন্তু মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, উপরোক্ত দুইটি শ্রেণীই চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত। প্রথমোক্ত শ্রেণীটির বিভ্রান্তি হইল, তাহারা কেবল শয়তানের কথা স্মরণ রাখাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং আল্লাহর জিকির ও স্মরণকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। এই শ্রেণীটির বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট। কেননা, আল্লাহ পাক আমাদিগকে এই কারণে শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হুকুম করিয়াছেন যেন আমরা আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল হইয়া না যাই। পক্ষান্তরে

আমাদের অন্তরে যদি সকল কিছু অপেক্ষা শয়তানের স্মরণই প্রবল হয়, তবে ইহা আমাদের জন্য কেবল ক্ষতিরই কারণ হইবে। কেননা, আমাদের অন্তরে যদি শয়তানের স্মরণই প্রবল হয়, তবে উহার স্বাভাবিক পরিণতিতে আমাদের জেহেন ও চিন্তা-চেতনা হইতে আল্লাহর নূর একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। শয়তান তো এই ধরনের অন্তরই খুঁজিয়া বেড়ায় যেই অন্তরে আল্লাহর জিকির-ফিকির এবং আল্লাহর নূর না থাকে। আর শয়তান যে এই ধরনের অন্তরকে সহজেই গ্রাস করিয়া লইবে, ইহাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। আমাদিগকে এমন হুকুম করা হয় নাই যে, আমরা কেবল শয়তানের জন্যই অপেক্ষা করিতে থাকিব এবং সর্বদা কেবল তাহার কথাই স্মরণ করিব।

দ্বিতীয় শ্রেণীটিও প্রথমোক্ত শ্রেণীর মত বিভ্রান্তিতে নিপতিত। তাহারাও আল্লাহর স্মরণ ও শয়তানের স্মরণ- এই দুইটি বিষয়কে একত্রিত করিয়াছে। উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে- মানুষের অন্তরে যেই পরিমাণ শয়তানের স্মরণ বিদ্যমান হইবে, তাহার অন্তর সেই পরিমাণেই আল্লাহর স্মরণ ও জিকিরের নূর হইতে বঞ্চিত হইবে। অথচ আল্লাহ্ পাক মানুষকে তাঁহার জিকির ও স্মরণের হুকুম করিয়াছেন। সুতরাং মোমেনের অন্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুই বিদ্যমান হওয়ার যোগ্য নহে। চাই তাহা শয়তানের স্মরণ হউক বা অন্য কিছু।

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে উপরে দুই শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করা হইল। এই ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হইল- মানুষ শয়তানকে ভয় করিবে এবং শয়তান যে মানুষের চির শত্রু এই কথাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবে। এই একীন ও বিশ্বাস যখন মোমেনের অন্তরে বিদ্যমান হইবে, তখন সে কেবল আল্লাহর কথাই স্মরণ রাখিবে এবং তাঁহার জিকিরেই নিরত থাকিবে। এমতাবস্থায় শয়তানের কথা সে কল্পনাও করিবে না এবং শয়তানের ভয় নিজের উপর আরোপ করার কোন প্রয়োজন হইবে না। কেননা, শয়তান যে তাহার চির শত্রু এই কথা তাহার অন্তরের গভীরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় শয়তান তাহাকে ওয়াসওয়াসা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে তাহা জানিতে পারিবে এবং উহার মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। আল্লাহর ইয়াদ ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেই শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাইবে না- এমন কোন কথা নাই। মনে কর, রাতে শয়নকালে কোন ব্যক্তির মনে যদি এই আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, আমি যদি প্রভাতের প্রথম প্রহরে জাগ্রত হইতে না পারি, তবে আমার অমুক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বিষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তবে রাতে কিছুক্ষণ পরপরই তাহার নিদ্রা টুটিয়া যাইবে এবং ঘুমের মধ্যেই সে বার বার চমকাইয়া উঠিবে। অথচ নিদ্রাবস্থায় সে এককভাবেই নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে এবং তখন তাহার সেই কাজের কথা স্মরণে থাকে না। কিন্তু তবুও যথা সময় জাগ্রত না হওয়ার আশঙ্কায় বার বার তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া

যাইতেছে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর ইয়াদ ও জিকিরে নিমগ্ন হওয়া- শয়তানের ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে অবগতি লাভের পথে অন্তরায় নহে।

কেবল সেই সকল অন্তরই শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে যাহারা আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকে, যাহাদের অন্তর নফসানী খাহেশাত হইতে মুক্ত এবং যাহাদের এলেম ও আকলের নূর খাহেশাতের তমশাকে মিটাইয়া দিয়াছে। নফসানী খাহেশাত হইতে অন্তর পাক হওয়ার উদাহরণ হইল কোন কূপকে নাপাকী হইতে পাক করার মত। তো যাহাদের অন্তরে শয়তানের স্মরণ বিদ্যমান থাকে তাহাদের অন্তর নাপাকী মিশ্রিত। সুতরাং যাহাদের অন্তরে আল্লাহর জিকির ও শয়তানের স্মরণ একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে তাহাদের অবস্থা যেন এইরূপ- মনে কর, কোন ব্যক্তি কূপ পাক করার সময় যদি এক দিক হইতে পানি পরিষ্কার করে এবং অন্য দিক হইতে উহাতে নাপাকী প্রবেশ করিতে থাকে তবে এইভাবে কখনো কূপ পাক হইবে না। বরং এইভাবে তাহার পরিশ্রম পণ্ড হইবে এবং উদ্দেশ্যও সফল হইবে না। সুতরাং উহা পাক করার উপায় হইল- আগে নাপাকী প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া উহা পরিষ্কার করার পর পাক পানি দ্বারা উহা ভরিয়া দিতে হইবে। অতঃপর নাপাকী আসিলেও উহা প্রবেশ করার পথ পাইবে না এবং কূপও আর নাপাক হইবে না।

এবাদত প্রকাশ করা যেই ক্ষেত্রে জায়েজ

এবাদত গোপনে করাই এখলাস ও আন্তরিকতার পরিচায়ক এবং গোপনে এবাদত করার মধ্যেই যেমন রিয়া হইতে মুক্ত থাকার উপকারিতা বিদ্যমান, তদ্রূপ এবাদত প্রকাশ করার মধ্যেও অপরের জন্য উহা অনুসরণ করা ও আমলের প্রতি উৎসাহিত হওয়ার উপকারিতা বিদ্যমান। অবশ্য এবাদত প্রকাশ করার মধ্যে রিয়ার আশংকা থাকে বটে। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, মুসলমানগণ এই কথা ভাল করিয়াই জানে যে, এবাদত গোপন রাখাই নিরাপদ। তবে উহা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও একটি ভালর দিক আছে। এই কারণেই পবিত্র কোরআনে গোপন ও প্রকাশ্য এই দুই প্রকার এবাদতেরই প্রশংসা করিয়া এরশাদ হইয়াছে-

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থঃ "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে তাহা কতইনা উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়া দাও, তবে তাহা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।" (সূরা বাক্বারাঃ আয়াত ২৭১)

এবাদত প্রকাশ করার দুইটি উপায় হইতে পারে। প্রথমতঃ মূল এবাদতটিই প্রকাশ করা। দ্বিতীয়তঃ এবাদত করার পর তাহা মানুষকে বলিয়া দেওয়া। নিম্নে

আমরা পৃথক শিরোণামে উহার উপর আলোচনা করিব।

মূল এবাদত প্রকাশ করা

মূল এবাদত প্রকাশ করার উদাহরণ হইল, প্রকাশ্যে লোকজনের সম্মুখে দান-সদকা করা যেন উহা দেখিয়া অপরাপর লোকেরাও দান-খয়রাত করার প্রতি উৎসাহিত হয়। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার জনৈক আনসারী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া একটি টাকার থলি পেশ করিলেন। অতঃপর তাহার দেখাদেখি উপস্থিত অপরাপর ছাহাবীগণও দান করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন–

من سن سنة حسنة فعمل بها كان له اجرها و اجر من اتبعه

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি একটি সৎকর্ম প্রচলন করে, অতঃপর মানুষ উহার উপর আমল করে, তবে সেই আমলের ছাওয়াব তো পাইবেই; যাহারা উহার অনুসরণ করে, তাহাদের ছাওয়াবও পাইবে।" (মুসলিম শরীফ)

অনুরূপভাবে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি এবাদতগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু দান-খয়রাতের অবস্থাটা একটু ভিন্ন রকম। কেননা, এই ক্ষেত্রে মানুষ একে অপরের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং একজনের দেখাদেখি অন্যরাও দান করার প্রতি উৎসাহিত হয়। একজন যোদ্ধা যখন আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তাহার পক্ষে সকলের সম্মুখেই উহার প্রস্তুতি গ্রহণ করা উত্তম। যেন তাহার দেখাদেখি অন্যরাও জেহাদের প্রতি উৎসাহিত হয়। এই এবাদত প্রকাশ করা এই কারণে ক্ষতিকর নহে যে, বস্তুতঃ জেহাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এমন একটি প্রকাশ্য এবাদত যাহা গোপনে করার কোন উপায় নাই। সুতরাং সকলের সম্মুখে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা "এবাদত প্রকাশ করা" নহে। উহার ফলে বরং দর্শকগণও জেহাদের প্রতি উৎসাহিত হইবে। অনুরূপভাবে রাতে তাহাজ্জুদের নামাজে শব্দ করিয়া ক্বেরাত পড়া যেন ঘরের অন্যরাও জাগিয়া উঠিয়া তাহার অনুসরণ করে– ইহাও ক্ষতিকর নহে।

মোটকথা, যেইসকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব নহে যেমন– জেহাদ, হজ্ব, জুমুআর নামাজ ইত্যাদি; এইগুলি অপরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে করা উত্তম। আর যেই সকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব, যেমন দান-খয়রাত, এইগুলি প্রকাশ্যে করিলে যদিও অপরের জন্য উৎসাহের কারণ হয় কিন্তু বিত্তহীন লোকেরা যদি এইগুলি দেখিয়া ব্যথা পায়, তবে গোপনে করাই উত্তম। কেননা, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া হারাম। যদি অপরের জন্য কোনরূপ কষ্টের কারণ না হয় তবে এই ক্ষেত্রে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অপরের জন্য উৎসাহের

কারণ হইলেও গোপনে করাই ভাল। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রকাশ্যে করা যদি অপরের জন্য উৎসাহের কারণ না হয়, তবে গোপনে করাই ভাল। আর অপরের জন্য উৎসাহের কারণ হইলে প্রকাশ্যে করা ভাল। উহার দলীল হইল, আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণকে প্রকাশ্যে ইবাদত করার হুকুম করিয়াছেন, যেন অন্যরা তাঁহাদের অনুসরণ করে। নবীগণ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করার অবকাশ নাই যে, তাঁহারা উত্তম আমল হইতে বঞ্চিত হইবেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে যেইরূপ আমল করার হুকুম করা হইয়াছিল উহা উত্তমই ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটিও প্রকাশ্য আমল উত্তম হওয়ার দলীল–

له اجرها و اجر من عمل بها

অর্থাৎ– "সে ঐ আমলের ছাওয়াব তো পাইবেই, যাহারা উহার অনুসরণ করে তাহাদের ছাওয়াবও পাইবে।" (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু দারদা ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ–

ان عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفا و يضاعف عمل العلانية اذا استن بعامله علي عمل السر سبعين ضعفا

অর্থঃ গোপন আমলের ছাওয়াব প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তরগুণ বেশী। কিন্তু যেই প্রকাশ্য আমল অন্যরা অনুসরণ করে, উহার ছাওয়াব গোপন আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। (বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নাই। কেননা, অন্তর যদি রিয়া হইতে পবিত্র হয় এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় আমলই যদি এখলাসের সহিত সম্পন্ন হয়, তবে প্রকাশ্য আমলই উত্তম হইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য অনুসরণের সুযোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই আমল দেখিয়া অন্যরাও এইরূপ আমল করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকাশ্য আমলের ক্ষেত্রে ভয় শুধু রিয়ার। আমলের সহিত যদি রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তবে এই রিয়াযুক্ত আমল দ্বারা নিজে ধ্বংস হইয়া অপরকে অনুসরণের সুযোগ দেওয়াতে কোন ফায়দা নাই।

প্রকাশ্য আমলের শর্ত

আমল প্রকাশের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথম বিষয়

এমন লোকদের সামনে আমল প্রকাশ করা যাহাদের সম্পর্কে উহা

অনুসরণের নিশ্চিত বিশ্বাস কিংবা সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। কেননা, এককভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষের আমল সকলেই অনুসরণ করিবে– এমন হওয়া সম্ভব নহে। যেমন, এক ব্যক্তিকে হয়ত ঘরের লোকেরা অনুসরণ করে কিন্তু প্রতিবেশীগণ তাহাকে অনুসরণ করে না। আবার কোন ব্যক্তিকে হয়ত প্রতিবেশীগণ অনুসরণ করে কিন্তু বাজারের লোকদের নিকট সে অনুসরণীয় নহে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে হয়ত তাহার মহল্লার লোকেরাই অনুসরণ করে কিন্তু মহল্লার বাহিরের লোকেরা তাহাকে অনুসরণ করে না।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও প্রসিদ্ধ আলেমগণকে প্রায় সকলেই অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি আলেম নহেন তিনি যদি নিজের কোন আমল প্রকাশ করেন, তবে এমনও হইতে পারে যে, সাধারণ লোকেরা হয়ত উহাকে রিয়া মনে করিয়া বসিবে এবং উহার ফলে তাহাকে অনুসরণের পরিবর্তে হয়ত তাহার নিন্দা করিতে শুরু করিবে। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে কস্মিনকালেও নিজের আমল জাহির করা উচিৎ নহে। কেননা, লোকেরা তাহার এবাদত কবুল করিবে না। সুতরাং যেই উদ্দেশ্যে আমল প্রকাশ করা হয় তাহা পূরণ হইবে না। মানুষের অনুসরণের নিয়তে কেবল এমন ব্যক্তিই নিজের আমল প্রকাশ করিতে পারিবে, যার মধ্যে মানুষের নিকট অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ আমভাবে ইহা সকলের কাজ নহে।

দ্বিতীয় বিষয়

দ্বিতীয়তঃ সর্বদা নিজের অন্তর ও আমলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন উহা রিয়া দ্বারা আক্রান্ত না হয়। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, মনের গহিন কোণে হয়ত রিয়া বিদ্যমান এবং সেই রিয়ার কারণেই হয়ত আমল জাহির করা হইতেছে– যদিও প্রকাশ্যে মানুষের অনুসরণের কথা বলা হইতেছে। অর্থাৎ সে হয়ত মনে মনে কামনা করিতেছে– আমার এই নেক আমল প্রকাশ হওয়ার ফলে আমি মানুষের নিকট অনুসরণীয় হইতে পারিব। অধিকাংশ লোকই সাধারণ মানুষের নিকট অনুসরণীয় হইতে পারিবে। অধিকাংশ লোকই সাধারণ মানুষের নিকট অনুসরণীয় হওয়ার আশায় এইভাবে নিজের আমল প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহাদের অন্তরে এখলাস আছে, তাহারা কখনো এইরূপ করিতে পারে না।

দুর্বলমনাদের অবস্থা যেন এইরূপ– কোন ব্যক্তি হয়ত নিজে ভালভাবে সাঁতার কাটিতে পারে না। কিন্তু যখন কতক ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়া যাইতে দেখিল, তখন উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেই বিপন্ন লোকদেরকে উদ্ধার করিতে আগাইয়া গেল। এমতাবস্থায় বিপন্ন লোকদের সকলেই প্রাণে রক্ষা পাওয়ার আশায় সেই ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিবে এবং উহার ফলে সে নিজেও ডুবিয়া মরিবে এবং অন্যরাও পানিতে তলাইয়া প্রাণ হারাইবে। তো পানিতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইবার কষ্ট স্বল্প সময়ের। কিন্তু রিয়ার কারণে যদি কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে অনন্তকাল আজাবের শিকার হইতে হইবে।

রিয়া এক সর্বনাশা ব্যাধি

রিয়া এমন এক সর্বনাশা ব্যাধি যে, উহাতে আলেম-আবেদ নির্বিশেষে সকলেই আক্রান্ত। একজন রিয়াকার মনে করে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন একজন বুজুর্গ যেইভাবে নিজের আমল প্রকাশ করেন, আমরাও সেইভাবেই নিজের আমল জাহির করিব। অথচ এই রিয়াকারের অন্তরে এখলাসের কোন শক্তি নাই। এমতাবস্থায় আমল প্রকাশ করিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে। অন্তরে রিয়ার উপস্থিতি অনুমান করা বড় কঠিন। আমল প্রকাশের ক্ষেত্রে রিয়ার সংমিশ্রণ আছে কিনা তাহা জানিবার উপায় হইল, এই সময় আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিবে যে, এখন যদি অন্য কোন আবেদ নিজের আমল প্রকাশ করিয়া মানুষের অনুসরণীয় হয়, তবে উহার পরও তুমি নিজের আমল প্রকাশ করার খাহেশ করিবে, না গোপন আমলকেই অগ্রাধিকার দিবে? অর্থাৎ উহার পরও যদি নফস এইরূপ খাহেশ করে যে, আমিই মানুষের অনুসরণীয় হইব, তবে মনে করিতে হইবে যে, এ স্থলে আমল প্রকাশের ক্ষেত্রে এখলাস বিদ্যমান নহে এবং ছাওয়াব প্রাপ্তিও উদ্দেশ্য নহে। বরং শুধুই রিয়ার জন্য আমল প্রকাশ করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে বরং তোমার উদ্দেশ্য এইরূপও নহে যে, তোমার আমল প্রকাশের ফলে মানুষের মধ্যে অনুকরণের অভ্যাস গড়িয়া উঠুক এবং তাহারাও যেন অপরের দেখাদেখি নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত হয়। কেননা, এই উৎসাহ তো আবেদগণকে দেখিয়াও হইতে পারে।

সুতরাং নফসের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রকাশ্য আমল খুব কমই বিপদমুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে সর্বদা আমলের নিরাপত্তার দিকটিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং এমন কোন বিষয়ের প্রত্যাশা করা সঙ্গত হইবে না যাহা দ্বারা নিজের কৃত আমল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ গোপনীয়তার মধ্যেই আমলের নিরাপত্তা নিহিত। আমল প্রকাশ করিয়া দিলে উহা এমন সব বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে যাহা অতিক্রম করা হয়ত আমাদের মত দুর্বলমনা লোকদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুতরাং আমল গোপন রাখিয়া উহা হেফাজত করাই সকলের কর্তব্য।

আমল করার পর তাহা প্রকাশ করা

আমল করার পর তাহা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যে, আমি অমুক আমল করিয়াছি– ইহার বিধানও প্রকাশ্যে আমল করার অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে বিপদের আশংকাও অধিক। কেননা, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়

না এবং এই বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় অতিরঞ্জনও হইয়া থাকে। কিন্তু তবুও এই মৌখিক প্রকাশ যদি রিয়ার কারণে হয়, তবে এই মৌখিক প্রকাশের কারণে বিগত এবাদতসমূহ বরবাদ হইবে না। এই হিসাবে ইহা ইতিপূর্বে বর্ণিত "মূল এবাদত প্রকাশ করা" এর তুলনায় কম বিপদজনক। তো যেই ব্যক্তির অন্তর মজবুত, পরিপূর্ণ এখলাসের অধিকারী এবং মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা যার নিকট সমান, সেই ব্যক্তি এমন লোকদের নিকট নিজের আমলের কথা প্রকাশ করিতে পারিবে, যাহাদের পক্ষ হইতে এই আমল অনুসরণের আশা করা যাইতে পারে এবং প্রকৃত অর্থেই যাহারা সৎ কাজের প্রতি উৎসাহী। অর্থাৎ নিয়ত পরিষ্কার ও মন বিপদমুক্ত হইলে এইভাবে নিজের আমল অপরের নিকট প্রকাশ করা জায়েজ ও মোস্তাহাব। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণও এইভাবে আমল প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

হযরত সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন নামাজ পড়ি নাই, যেই নামাজে কেবল নামাজ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আমার মনে উদিত হইয়াছে এবং এমন কোন জানাজার পিছনে যাই নাই, যাহাতে মাইয়্যাতের সাওয়াল-জওয়াবের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আমার মনে আসিয়াছে। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহাকিছু শুনিয়াছি, উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এই বিষয়ে পরওয়া করি নাই যে, আমি গরীব না বিত্তবান। কেননা, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি আমার জন্য কল্যাণকর তাহা আমার জানা নাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সর্বদা বর্তমান অবস্থা হইতে পরবর্তী অবস্থায় উন্নীত হওয়ার বাসনা পোষণ করিয়াছি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইআত হওয়ার পর আমি কখনো জিনা করি নাই, মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ডান হাতে আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করি নাই।

হযরত সুফিয়ান (রাঃ) মৃত্যুর সময় নিজের গৃহবাসীকে বলিলেন, আমার জন্য ক্রন্দন করিও না। কেননা, ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোন গোনাহের কর্মে সংশ্লিষ্ট হই নাই। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেন, আমার জীবনে কখনো এইরূপ হয় নাই যে, আল্লাহ পাক আমার উপর কোন হুকুম করিয়াছেন আর আমি এইরূপ কামনা করিয়াছি যে, আজ এই হুকুম না হইয়া অন্য কোন হুকুম হইলে ভাল হইত।

মোটকথা, এইসব বিবরণ দ্বারা নিজের উত্তম অবস্থা প্রকাশ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রিয়াকার যদি নিজের এবাদতের কথা প্রকাশ করে, তবে তাহা যঘন্য রিয়ার মধ্যে গণ্য হইবে। আর কোন পরহেজগার-মোত্তাকী ও

অনুসরণীয় ব্যক্তি যদি নিজের এবাদত প্রকাশ করে, তবে তাহা অপরের জন্য উৎসাহের কারণ হইবে।

সারকথা হইল, পরিপূর্ণ এখলাসের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অপরকে উৎসাহিত করার নিয়তে নিজের এবাদত জাহির করা জায়েজ। তবে এই ক্ষেত্রেও সেইসকল শর্ত প্রযোজ্য হইবে- যাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমল প্রকাশ করার পথ একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া এই কারণে সঙ্গত নহে যে, অনুকরনপ্রীয়তা হইল মানুষের একটি স্বভাবজাত গুণ এবং মানুষ সাধারণতঃ অপরের দেখাদেখি আমল করিয়া থাকে। এমনকি কোন রিয়াকার যদি নিজের এবাদত প্রকাশ করে আর মানুষ যদি না জানে যে, সে রিয়া করিতেছে, তবে উহা দ্বারাও মানুষ উপকৃত হইবে। অবশ্য রিয়াকার তাহার রিয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বটে। আল্লাহর অনেক নেক বান্দা এমনও আছেন, যাহারা কোন রিয়াকারের আমলের অনুসরণ করিয়া এখলাস ও একীনের উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

এক সময় এমন ছিল, যখন ফজরের নামাজের পর বসরা শহরের প্রতিটি ঘর হইতে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ভাসিয়া আসিত। পরে এক ব্যক্তি রিয়ার অনিষ্টের উপর একটি কিতাব লিখিবার পর সেই আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায় এবং মানুষ নীরবে তেলাওয়াত করিতে শুরু করে। অথচ তেলাওয়াতের এই আওয়াজ অপরের জন্য উৎসাহের কারণ ছিল। পরবর্তীতে এই অবস্থার উপর এক ব্যক্তি মন্তব্য করিলেন, রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে কিতাব না লিখিলেই ভাল হইত। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কোন রিয়াকার যদি তাহার আমল প্রকাশ করে, তবে উহা দ্বারাও অন্যরা উপকৃত হইতে পারিবে। তবে এই ক্ষেত্রে শর্ত হইল, অপরাপর লোকেরা সেই ব্যক্তির রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ হইতে হইবে। এতদ্ সম্পর্কিত এক হাদীসে আছে-

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা পাপী লোক দ্বারা দ্বীনের শক্তি যোগাইবেন।"

গোনাহ গোপন করার বৈধতা এবং মানুষকে গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করার নিন্দা

এখলাসের মূল কথা হইল, মানুষের ভিতর-বাহিরে এক রকম নিয়ত হওয়া। যেমন একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি প্রকাশ্য আমলকে নিজের জন্য আবশ্যক করিয়া লও। লোকটি আরজ করিল, প্রকাশ্য আমল কি? তিনি বলিলেন, প্রকাশ্য আমল হইল, যেই আমল সম্পর্কে অপর কেহ জানিতে পারিলে আমলকারী লজ্জিত হয় না।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমার আমল সম্পর্কে অপর কেহ অবগত হইলে এই বিষয়ে আমি কিছুমাত্র পরওয়া করি না। অবশ্য স্ত্রীসহবাস ও মলত্যাগ– কেবল এই দুইটি বিষয় অপর কেহ অবগত হওয়া আমি পছন্দ করি না। চারিত্রিক উৎকর্ষতার ইহা এমন এক স্তর যে, সকলের পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয় না।

মানুষের স্বভাবই হইল এইরূপ যে, সে অন্তর ও অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা গোনাহ করিয়া তাহা গোপন রাখে। কেননা, তাহার পাপাচার সম্পর্কে অপর কেহ অবগত হউক, ইহা তাহার কাম্য নহে। অথচ আল্লাহ পাক মানুষের সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। নিজের দোষ অপরের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখা ইহাও রিয়ার মধ্যে গণ্য। অবশ্য ইহা প্রকৃত রিয়া নহে। এখানে রিয়া হইল– নিজেকে পরহেজগার ও মোত্তাকী হিসাবে জাহির করার উদ্দেশ্যে নিজের গোনাহসমূহ গোপন করিয়া রাখা। অর্থাৎ এখানে সে নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিয়া নিজেকে যেইরূপ বুজুর্গ হিসাবে জাহির করিতেছে, প্রকৃতপক্ষে সে ঐরূপ বুজুর্গ নহে। যেই ব্যক্তি সৎ এবং রিয়াকার নহে, সেই ব্যক্তির পক্ষেও নিজের গোনাহ গোপন রাখা উচিৎ। নিজের গোনাহ গোপন করা এবং এই গোনাহ সম্পর্কে মানুষের অবগতির ফলে দুঃখিত ও পেরেশান হওয়া আট কারণে সঠিক হইতে পারে।

প্রথম কারণ

প্রথম কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কারণে খুশী ছিল যে, আল্লাহ পাক তাহার অপরাধসমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যখনই তাহার সেই অপরাধসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সে দুঃখিত ও পেরেশান হইল যে, আল্লাহ পাক তাহার গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহার ভয় হইতেছে যে, রোজ কেয়ামতেও তাহাকে এইভাবে অপমানিত হইতে হয় কি-না। যেমন এক হাদীসে আছে–

ما ستر الله على عبد ذنبا في الدنيا الا ستره عليه في الاخرة

অর্থঃ "দুনিয়াতে আল্লাহ যেই গোনাহ গোপন রাখেন আখেরাতেও সেই গোনাহ গোপন রাখিবেন।" (মুসলিম শরীফ)

এই পেরেশানীও ঈমানী শক্তি হইতেই উৎসারিত। যেই ব্যক্তির ঈমান দুর্বল, এইসব কারণে তাহার মন পেরেশান হইবে না।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহা জানে যে, আল্লাহ পাক গোনাহ প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। বরং গোনাহ গোপন রাখাই তিনি পছন্দ করেন।

অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদিও আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে, কিন্তু অন্তর দ্বারা এমন বিষয়কেই পছন্দ করে– যাহা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। ইহাও ঈমানী শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। এই ব্যক্তি ইহা কামনা করে না যে, তাহার গোনাহ প্রকাশ হউক। কেননা, আল্লাহ পাক গোনাহ প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।

তৃতীয় কারণ

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানুষের নিন্দার কারণে দুঃখিত হয়। কেননা, তাহার পাপাচার দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মন্দ বলে এবং তাহাদের এই নিন্দাবাদ মন ও বিবেককে আল্লাহর আনুগত্য হইতে ফিরাইয়া রাখে। অর্থাৎ মানুষের নিন্দার কারণে মনে কষ্ট অনুভব হয় এবং এই কষ্টের কারণেই সে বিবেকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া উহাকে আল্লাহর আনুগত্য করিতে দেয় না। তবে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে এই ব্যক্তির সততা ও সুস্থ বিবেচনার পরিচয় হইল– মানুষের নিন্দার কারণে যেমন সে কষ্ট অনুভব করে, তদ্রূপ মানুষের প্রশংসার কারণেও কষ্ট অনুভব করা উচিৎ– যাহা আল্লাহর স্মরণ হইতে মানুষের অন্তরকে গাফেল করিয়া দেয়। কেননা, এখানে মানুষের নিন্দার কারণে যেই অবস্থাটি সৃষ্টি হয়, উহা মানুষের প্রশংসার মধ্যেও বিদ্যমান। তো মানুষের আত্মার এই অবস্থাটি ঈমানী শক্তি হইতেই উৎসারিত।

চতুর্থ কারণ

চতুর্থ কারণ হইল, মানুষ এই কারণে গোনাহ গোপন করিতে চাহে যে, মানুষের নিন্দা তাহার নিকট ভাল লাগে না। কেননা, উহার কারণে মনে এমন কষ্ট অনুভব হয়– যেমন প্রহার করিলে দেহে কষ্ট অনুভব হয়। নিন্দার কারণে মনে কষ্ট অনুভব হওয়ার আশংকা করা নিষিদ্ধ নহে এবং এই আশংকার কারণে মানুষ গোনাহগার হইবে না। অবশ্য নিন্দার আশংকার কারণে যদি কোন নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়, তবে অবশ্য গোনাহগার হইবে। মোটকথা, মানুষের উপর ইহা ওয়াজিব নহে যে, অপর কাহারো নিন্দার কারণে দুঃখিত ও মর্মাহত হওয়া যাইবে না। তবে এই ক্ষেত্রে মানুষের মমতা ও আন্তরিকতার পরিচয় হইল, মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হওয়ার বাসনা বর্জন করা এবং প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী এই উভয় ব্যক্তিকেই এক রকম মনে করা। কেননা, তাহার তো এই কথা জানা আছে যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই মানুষের লাভ-লোকসানের মালিক এবং এই ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নাই। অবশ্য এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ মানুষই লোক নিন্দার কারণে মনে কষ্ট অনুভব করে। কেননা, মানুষের নিন্দার কারণেই সে নিজের ত্রুটি বিষয়ে জ্ঞাত হয়।

অবশ্য আমরা বলিব, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের নিন্দার কারণে দুঃখিত হওয়া উত্তম বটে। বিশেষতঃ এই নিন্দা যখন কোন দ্বীনদার-পরহেজগার ও মোখলেস

ব্যক্তির পক্ষ হইতে হয়। কেননা, নেককার বান্দাগণ আল্লাহর সাক্ষী হইয়া থাকেন এবং তাহাদের নিন্দার কারণে ইহা জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর নিকটও নিন্দনীয়। এই কারণেই আল্লাহর ওলীদের নিন্দার কারণে দুঃখিত হওয়া চাই। অবশ্য এমন দুঃখকে নিন্দনীয় বলা হইবে, যেই দুঃখ এই কারণে অনুভূত হয় যে, "অমুক ব্যক্তি আমার তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রশংসা করে নাই।" কেননা, ধর্মীয় আনুগত্য ও এবাদতের উপর প্রশংসা কামনা করা, যেন আল্লাহর এবাদত করিয়া গায়রুল্লাহর নিকট বিনিময় প্রার্থনা করারই নামান্তর। কাহারো অন্তরে যদি এই ধরনের বিপদ উপস্থিত হয়, তবে উহাকে ক্ষতিকর মনে করিতে হইবে।

অবশ্য গোনাহের কারণে মানুষের নিন্দাকে খারাপ মনে করা ইহা মানুষের স্বভাবজাত অবস্থা। ইহাকে নিন্দনীয় বলা যাইবে না। কারণ, মানুষের নিন্দার ভয়ে গোনাহ গোপন করা জায়েজ। তবে মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব যে, সে মানুষের প্রশংসার প্রত্যাশী হয় না বটে কিন্তু মানুষের নিন্দাকে খারাপ মনে করে। কিংবা এইরূপ কামনা করা যে, মানুষ যেন আমার প্রশংসাও না করে এবং নিন্দাও না করে। মানুষের প্রশংসা না পাইয়া ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি নিন্দার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করিতে পারে না। কেননা, মানুষ এক প্রকার সুখ লাভের জন্যই প্রশংসা কামনা করে। কিন্তু এইসুখ হাসিল না হইলে কষ্ট অনুভব হয় না। কিন্তু নিন্দার কারণে কষ্ট অনুভব হয়। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করিয়া মানুষের প্রশংসা কামনা করে সেই ব্যক্তি উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই আনুগত্যের বিনিময় প্রাপ্ত হয় বটে। কিন্তু গোনাহের কারণে নিন্দাকে খারাপ মনে করার ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান নহে। সেই ক্ষেত্রে কেবল এই আশংকা থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের গোনাহ সম্পর্কে মানুষের অবগতির আশংকার কারণে আল্লাহর অবগতি বিষয়ে গাফেল হইয়া যায় কি-না। যদি এইরূপ হয়, তবে ইহা মানুষের জন্য যারপর নাই ক্ষতিকারক। সুতরাং মানুষের কর্তব্য– নিজের গোনাহ সম্পর্কে মাখলুকের অবগতি অপেক্ষা আল্লাহর অবগতিতে অধিক পেরেশান হওয়া।

পঞ্চম কারণ

মানুষের নিন্দাকে এই কারণে খারাপ মনে করা যে, নিন্দাকারী আল্লাহর নাফরমানী করিতেছে। অর্থাৎ এই অনুভূতির উৎসমূলও সেই ঈমানী শক্তি। এই ঈমানী চেতনার আলামত হইল– নিজের নিন্দাকে যেমন খারাপ মনে করা হয়, তদ্রূপ অপর মানুষের নিন্দাকেও খারাপ মনে করা। কেননা, এই উভয় ক্ষেত্রের মূল কারণ অভিন্ন। সুতরাং নিজের নিন্দার কারণে যেই পরিমাণ কষ্ট অনুভব হয়, অপরের নিন্দার কারণেও সেই পরিমাণই কষ্ট অনুভব হওয়া চাই।

ষষ্ঠ কারণ

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কারণে নিজের গোনাহ গোপন করে যে, এই গোনাহের কারণে যেন অপর কেহ তাহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে। ইহা নিন্দার কষ্ট হইতে পৃথক ও ভিন্ন একটি অনুভূতি। নিন্দার কষ্ট এই কারণে অনুভূত হয় যে, সে মনে করে, এই নিন্দার ফলে লোকেরা তাহার ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়– যদিও নিন্দাকারীর অনিষ্ট হইতে সে নিরাপদ থাকে। অনেক সময় এইরূপও হয় যে, কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক যদি তাহার অপরাধ ও ত্রুটি সম্পর্কে জানিতে পারে, তবে সে মৌখিক নিন্দার পাশাপাশি অন্য কোন দুর্ব্যবহারও করিতে পারে। এইরূপ অনিষ্টের ভয়ে নিজের গোনাহ গোপন করা জায়েয।

সপ্তম কারণ

সপ্তম কারণ হইল, লজ্জার কারণে নিজের গোনাহ গোপন করা। লজ্জা মানুষের একটি উত্তম স্বভাব বটে। শৈশব অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন বুদ্ধি-বিবেচনার জগতে পা রাখে, তখনই মানুষের অন্তরে এই লজ্জা পয়দা হয়। অন্তরে এই লজ্জা পয়দা হওয়ার পর তাহার কোন আয়েব ও দোষ-ত্রুটি অপর কেহ জানিতে পারিলে সে লজ্জা অনুভব করে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

الحياء خير كله অর্থাৎ– "লজ্জার পরিপূর্ণটাই মঙ্গল। (মুসলিম শরীফ)

অন্য হাদীছে আছে–

الحياء شعبة من الايمان অর্থঃ "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।" (বোখারী, মুসলিম)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان الله يحب الحي الحليم

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল ও সহনশীল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন।" (তাবরানী)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে–

الحياء لا يأتى الا بخير অর্থঃ "লজ্জার পরিণাম শুধুই কল্যাণ।"

যেই ব্যক্তি অপরাধকর্মে লিপ্ত, আর এই বিষয়ে সে বিন্দু মাত্র পরওয়া করে না যে, মানুষ তাহার অপরাধ সম্পর্কে অবগত; তবে সে যেন গোনাহের কাজের পাশাপাশি নির্লজ্জতারও শিকার হইয়াছে। এই ব্যক্তি এমন মানুষের তুলনায় নিকৃষ্ট, যে নিজের অপরাধ গোপন রাখে এবং মানুষকে লজ্জা পায়।

এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– লজ্জা রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ

সাদৃশ্যপূর্ণ। খুব কম মানুষই এই দুইটি বিষয়কে পৃথক করিতে পারে। অধিকাংশ মানুষই মনে করে বাস্তবিক পক্ষেই আমি লজ্জাশীল এবং এই লজ্জাশীলতার কারণেই আমি উত্তম রূপে এবাদত করি। অথচ তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। লজ্জাশীলতা এমন এক উত্তম স্বভাব যাহা শরীফ ও সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্তরে পয়দা হয়। এই লজ্জাশীলতার পরই অন্তরে রিয়া ও এখলাসের উপকরণসমূহের আগমন ঘটে। সুতরাং এমনও সম্ভব যে, মানুষ লজ্জাশীলতার কারণে রিয়াকার হইয়া যাইবে এবং ইহাও সম্ভব যে, এই লজ্জার কারণেই সে এখলাসের অধিকারী হইবে।

উপরোক্ত অবস্থাটির উদাহরণ যেন এইরূপ- মনে কর, এক ব্যক্তি তাহার কোন বন্ধুর নিকট কিছু অর্থ করজ চাহিল। বন্ধুর ইচ্ছা নহে তাহাকে করজ দেওয়া। কিন্তু সে তাহাকে সরাসরি নিষেধ করিতে লজ্জা পাইতেছে। সে ইহাও জানে যে, বন্ধুটি যদি না আসিয়া অন্য কাহারো মাধ্যমে করজ চাহিয়া পাঠাইত, তবে সরাসরি তাহাকে নিষেধ করিয়া দিত। অর্থাৎ লোক দেখানো রিয়া কিংবা ছাওয়াবের আশায় তাহাকে করজ দিত না। এমতাবস্থায় এই করজদাতাকে কয়েকটি অবস্থায় বিবেচনা করা হইবে-

(এক) করজ দিতে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করিয়া দেওয়া এবং লজ্জা-শরমের কোন পরওয়া না করা। অর্থাৎ যেই ব্যক্তির লজ্জা-শরম কম, সেই ব্যক্তিই এইভাবে সরাসরি অস্বীকার করিয়া দিতে পারিবে। কেননা, একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি হয় তাহাকে করজ দিয়া দিবে কিংবা করজ না দেওয়ার কারণ হিসাবে কোন ওজর পেশ করিবে যে, অমুক অসুবিধার কারণে করজ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। পক্ষান্তরে এই ব্যক্তি যদি করজ দিয়া দেয়, তবে মনে করিতে হইবে- তাহার লজ্জার সঙ্গে রিয়ার সংমিশ্রণ আছে। অর্থাৎ লজ্জার কারণেই তাহার রিয়া ক্রিয়াশীল হইয়াছে এবং মনে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে যে, করজপ্রার্থী বন্ধুটিকে ফেরৎ দেওয়া ঠিক হইবে না। বরং তাহাকে করজ দিয়া দেওয়াই উচিৎ যেন তাহার প্রশংসা করে এবং তাহাকে একজন উদার ব্যক্তি বলিয়া তাহার সুখ্যাতি করে। কিংবা তাহাকে এই কারণে করজ দিয়া দেওয়া উচিৎ যেন সে তাহার নিন্দা করার সুযোগ না পায় এবং তাহাকে 'কৃপণ' আখ্যা দিয়া তাহার দুর্ণাম করিতে না পারে। অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি সে বন্ধুকে করজ দেয়, তবে তাহার এই আমলটি রিয়ার সহিতই যুক্ত হইবে।

(দুই) দ্বিতীয় অবস্থা হইল- লজ্জার কারণে করজ দিতে অস্বীকারও করিতে পারিতেছে না, আবার কৃপণতার কারণে করজ দিতেও মন আগাইতেছে না। এই দ্বৈত অবস্থার টানাপোড়নের এক পর্যায়ে তাহার অন্তরে এখলাসের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং মনে এই ধারণা সৃষ্টি হইল যে, দান করার ছাওয়াব এক গুণ

এবং করজ দেওয়ার ছাওয়াব আঠার গুণ। অর্থাৎ করজ দেওয়ার ছাওয়াবও বেশী এবং ইহাতে বন্ধুর মনও রক্ষা হইবে। বন্ধুর মন রক্ষা করা ইহা আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় আমল। মোটকথা, অন্তরে এখলাস ক্রিয়াশীল হওয়ার পর সে করজ দিতে উদ্বুদ্ধ হইল।

(তিন) তৃতীয় অবস্থা হইল- এই ক্ষেত্রে তাহার ছাওয়াব পাওয়ারও কোন আশা নাই এবং নিন্দারও ভয় নাই। এমনকি প্রশংসা প্রাপ্তিরও কোন খাহেশ নাই। বন্ধুর পরিবর্তে যদি তাহার কোন প্রতিনিধি করজ চাহিতে আসিত, তবে কস্মিনকালেও সে তাহাকে করজ দিত না। এমতাবস্থা নিছক লজ্জার কারণেই সে করজ দিতেছে। যদি কোন অপরিচিত ও সাধারণ মানুষ তাহার নিকট করজ চাহিত, তবে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া দিত- যদিও এই করজ দেওয়ার কারণে তাহার প্রচুর ছাওয়াব হইত কিংবা দেশময় তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষেত্রে করজ দেওয়ার পিছনে তাহার লজ্জাশীলতাই কাজ করিয়াছে। লজ্জার এই অবস্থাটি কেবল মন্দ কর্মের ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। যেমন- কৃপণতা বা অন্য কোন পাপকর্ম। কিন্তু একজন রিয়াকার মোবাহ ও বৈধ কর্মের ক্ষেত্রেও লজ্জা পায়। সুতরাং সে যখন কোন কারণে দৌড়াইতে থাকে, তখন কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলামাত্র সে গতি শ্লথ করিয়া স্বাভাবিকভাবে হাঁটিতে থাকে। কিংবা হাস্য করার সময় কেহ দেখিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে। আর তাহার ধারণায় লজ্জার কারণেই সে এইরূপ করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহা লজ্জা নহে, ইহা বরং সুস্পষ্টভাবেই রিয়া।

এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল- সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু লজ্জা ভাল নহে। ধর্ম-কর্মে লজ্জা করা নিন্দনীয়। যেমন- মানুষকে নসীহত করিতে লজ্জা করা কিংবা নামাজের ইমামতি করিতে লজ্জা করা ইত্যাদি। এই জাতীয় লজ্জা নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে শোভনীয় বটে। জ্ঞানবান লোকদের ক্ষেত্রে এইরূপ লজ্জা পছন্দনীয় নহে। অনেক সময় হয়ত কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে গোনাহ করিতে দেখিয়াও কেবল তাহার বার্ধক্যের কারণেই কিছু বলা হয় না। এইরূপ লজ্জা ভাল। কেননা, কোন বৃদ্ধ মুসলমানকে তাজীম করা আল্লাহকে তাজীম করার মতই। কিন্তু এতদঅপেক্ষা উত্তম হইল আল্লাহকে লজ্জা করা। মানুষকে লজ্জা করিয়া সৎ কাজের আদেশের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হওয়া ঠিক নহে। যাহারা ক্ষমতাবান, তাহাদের পক্ষে মানুষকে লজ্জা না করিয়া আল্লাহকে লজ্জা করাই উত্তম। অবশ্য যাহারা দুর্বল তাহাদের কথা ভিন্ন।

অষ্টম কারণ

অষ্টম কারণ হইল, নিজের গোনাহ প্রকাশ হইয়া পড়ার ক্ষেত্রে এই কারণে শঙ্কিত হওয়া যে, তাহার দেখাদেখি অপরাপর লোকেরাও গোনাহ করিতে শুরু

করিবে। ইহা সেই 'কারণ' যেই কারণের ভিত্তিতে এবাদত জাহির করা বৈধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এবাদত জাহির করা এই কারণে বৈধ করা হয় যে, উহা দেখিয়া যেন অপরাপর লোকেরাও উৎসাহিত হইয়া এবাদত করিতে শুরু করে। অবশ্য ইহা সকলের কাজ নহে। ইহা কেবল শরীয়তের ইমাম ও নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের কাজ। এই কারণের ভিত্তিতেই নিজের অপরাধ পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে গোপন করা জায়েয। কেননা, পরিবারের লোকেরা তাহার অনুকরণ করিবে।

উপরে গোনাহ গোপন করার আটটি কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অষ্টম কারণটি ব্যতীত অন্য কোন কারণেই আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত প্রকাশ করা যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের পাপাচার গোপন করিয়া নিজেকে বুজুর্গ হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে রিয়াকার বলা হইবে। যদি বলা হয় যে, মানুষ নিজের তাকওয়া-পরহেজগারী ও যোগ্যতার অনুপাতে মানুষের প্রশংসা কামনা করা এবং মানুষও সেই অনুপাতেই তাহার প্রশংসা করা জায়েজ হওয়া উচিৎ। যেমন এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল–

دلنى على ما يحبني الله عليه و يحبنى الناس قال ازهد في الدنيا

يحبك الله و انبذ اليهم هذا الحطام يحبوك

অর্থঃ আমাকে এমন একটি আমল বলিয়া দিন, সেই আমলের কারণে যেন আল্লাহ আমাকে মোহাব্বত করেন এবং মানুষও আমাকে মোহাব্বত করে। তিনি এরশাদ করিলেনঃ তুমি দুনিয়াতে যুহদ (বা সংসারের প্রতি উদাসীনতা) অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাকে মোহাব্বত করিবেন। আর দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ মানুষের দিকে নিক্ষেপ কর, ফলে লোকেরা তোমাকে মোহাব্বত করিবে।

(ইবনে মাজা)

উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে আমরা বলিব, এইভাবে মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা বৈধ, পছন্দনীয় কিংবা নিন্দণীয়ও হইতে পারে। পছন্দনীয় হওয়ার ছুরত হইল– তুমি যদি মানুষের মোহাব্বতকে আল্লাহরই মোহাব্বত মনে করিয়া এইরূপ চিন্তা কর যে, আল্লাহ পাক যখন তাহার কোন বান্দাকে মোহাব্বত করেন, তখন মানুষের অন্তরেও তাহার প্রতি মোহাব্বত পয়দা করিয়া দেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি নিজের হজ্ব, জেহাদ কিংবা কোন নামাজের কারণে মানুষের প্রশংসা প্রত্যাশা কর, তবে তোমার এই প্রত্যাশা হইবে নিন্দনীয়। কেননা, এখানে আল্লাহর এবাদতের বিনিময়ে ছাওয়াবের পরিবর্তে মানুষের নিকট উহার বিনিময় প্রার্থনা করা হইতেছে। অনুরূপভাবে মোবাহ ছুরত হইল–

নিজের কোন উত্তম গুণ কিংবা নির্দিষ্ট কোন এবাদতের কারণ ছাড়াই মানুষের মোহাব্বতের প্রত্যাশী হওয়া।

রিয়ার ভয়ে এবাদত বর্জন করা

এক শ্রেণীর মানুষ রিয়াকার হইয়া যাওয়ার ভয়ে আমলই বর্জন করিয়া বসে। এইভাবে আমল বর্জন করা ঠিক নহে এবং ইহা প্রকারন্তরে শয়তানের সহযোগিতাই বটে। কোন বিপদাশংকার কারণে আমল ত্যাগ করা যাইবে কি-না, ইহা একটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয়। নিম্নে আমরা এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করিব।

আমল দুই প্রকার

প্রথমতঃ এমন আমল যেই আমলের মধ্যে কোন আনন্দ নাই। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জেহাদ ইত্যাদি। এইসব আমলের মধ্যে কেবল মোজাহাদা-মোশাক্কাত ও শ্রম-সাধনাই বিদ্যমান। এই সব আমল উপস্থিত ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক না হইলেও এই হিসাবে আনন্দদায়ক বলা যাইতে পারে যে, ইহা মানুষের প্রশংসা অর্জনের উপকরণ। মানুষের প্রশংসা দ্বারা আনন্দ অর্জিত হওয়া সুস্পষ্ট। আর মানুষ সংশ্লিষ্ট আমল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরই আমলকারীর প্রশংসা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এমনসব আমল যেইগুলি স্বয়ং আনন্দদায়ক। এই সব আমল দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, বরং সাধারণ মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। যেমন– খলিফা, বিচারপতি ও শাসক নিযুক্ত হওয়া বা নামাজের ইমাম, উপদেষ্টা ও শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। এই সকল বিষয় যেহেতু সাধারণ মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং উহার বিপদাশংকাও যেমন বেশী, তদ্রূপ এইগুলিতে আনন্দের উপকরণও বেশী।

দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট এবাদত

এমনসব এবাদত যেইগুলি সরাসরি দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দেহ ব্যতীত অন্য কিছুর সহিত যেইগুলির কোন সম্পর্ক নাই এবং উপস্থিত উহাতে কোন আনন্দও নাই। যেমন– রোজা, নামাজ, জেহাদ ইত্যাদি। এই সকল এবাদতের মধ্যে তিন অবস্থায় রিয়া আসিয়া যুক্ত হয়।

প্রথম অবস্থা

আমলের পূর্বেই রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আমল শুরু করা হয়। এইরূপ আমলের পিছনে যেহেতু কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং এই আমল পরিত্যাগ করা উচিৎ। কেননা, ইহাতে কোন এবাদত নাই এবং ইহা পরিষ্কার গোনাহ। ইহা বরং এবাদতের নামে মর্যাদা

লাভের অপচেষ্টামাত্র। এখন কোন ব্যক্তি যদি অন্তর হইতে এই রিয়া দূর করিতে পারে এবং অন্তরকে এই কথা বুঝাইতে পারে যে, মানুষের জন্য আমল না করিয়া বরং আল্লাহর জন্য আমল করা উচিৎ; অতঃপর যদি তাহার অন্তর খালেছ আল্লাহর জন্য এবাদত করিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আমল করাতে কোন ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় অবস্থা

প্রথমতঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আমল করার নিয়ত ছিল, কিন্তু আমল শুরু করার পর কিংবা সূচনাতেই রিয়া আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমল বর্জন করা উচিৎ নহে। কেননা, এই আমলের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় উদ্দেশ্য বিদ্যমান। পরে যেই রিয়া আসিয়া যুক্ত হইয়াছে উহা দূর করার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করিতে হইবে।

তৃতীয় অবস্থা

প্রথমতঃ এখলাসের সাথেই আমল শুরু করা হইয়াছিল। কিন্তু আমলের মাঝামাঝি আসিয়া রিয়া যোগ হইয়াছে। এই অবস্থায়ও রিয়া দূর করার জন্য চেষ্টা চালাইতে হইবে এবং আমল বর্জন করা যাইবে না। কেননা, শয়তান প্রথমেই মানুষকে আমল ত্যাগ করাইতে চাহে। কিন্তু মানুষ যদি শয়তানের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিয়া আমলে জমিয়া থাকে, তবে এই পর্যায়ে শয়তান তাহাকে রিয়ার দিকে আহ্বান করে। এই আহ্বানও উপেক্ষা করিলে শয়তান তাহাকে বলে, হে আদম সন্তান! তোমার আমলে কোন এখলাস নাই, তুমি রিয়াকার। সুতরাং তোমার এই এবাদতের সমুদয় আয়োজন-উদ্যোগ কেবল পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নহে। অর্থাৎ এইভাবেই শয়তান মানুষকে আমল বর্জনের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

রিয়ার ভয়ে আমল বর্জনকারীর উদাহরণ

যেই ব্যক্তি রিয়ার ভয়ে আমল বর্জন করে, তাহার উদাহরণ যেন এইরূপ– মনে কর, কোন মনিব তাহার গোলামকে কিছু গম দিয়া বলিল, এইগুলি ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া আন। গোলাম মনে করিল, আমার পক্ষে যেহেতু এইগুলি পরিষ্কার করা সম্ভব নহে, সুতরাং আমি ইহা ধরিয়াও দেখিব না। তো ঐ ব্যক্তির অবস্থাও এই গোলামের মত– এখলাস না থাকার কারণে যে আমলই বর্জন করিয়া বসে। ঐ ব্যক্তিও এই শ্রেণীভুক্ত, যেই ব্যক্তি নিছক এই আশংকার কারণে আমল বর্জন করে যে, লোকেরা আমাকে রিয়াকার বলিবে এবং আমিও এইরূপ আমল করিয়া রিয়াকার হইব। এই সবই হইল শয়তানের প্রতারণা।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে প্রথম কথা হইল, কোন মুসলমান সম্পর্কে অকারণে

এইরূপ কুধারণা করা ঠিক নহে যে, সে কোন মোখলেস ব্যক্তিকে রিয়াকার বলিবে। যদি কেহ এইরূপ বলেও, তবে তাহাকে বলিতে দাও। তাহার এইরূপ বলার কারণে তোমার আমল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সুতরাং কি কারণে তুমি নিজের আমল বন্ধ করিয়া ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে? তদুপরি এই কারণে আমল ত্যাগ করা যে, "মানুষ আমাকে রিয়াকার বলিবে"– ইহাই বরং সুস্পষ্ট রিয়া। তোমার মধ্যে যদি মানুষের প্রশংসার খাহেশ ও নিন্দার ভয় না থাকিবে, তবে তো কস্মিনকালেও তুমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না– চাই তাহারা তোমাকে রিয়াকার বলুক বা মোখলেস বলুক। "মানুষ রিয়াকার বলিবে" এই আশংকায় আমল বর্জন করা গুরুতর অপরাধ। অর্থাৎ এই সবই হইল শয়তানের প্রতারণা। সাধারণতঃ জাহেল আবেদগণই এইরূপ প্রতারণার শিকার হইয়া থাকে।

আমল ত্যাগ করা শয়তান হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নহে

আমল ত্যাগ করিলেই কি ইহা প্রমাণ হইবে যে, তুমি শয়তানের প্রতারণা হইতে রক্ষা পাইয়াছ? শয়তান তো এই অবস্থায়ও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। বরং এই সময় সে তোমাকে বলিবে, তুমি আমল ত্যাগ করিয়াছ অকপট ও মোখলেস আখ্যা পাওয়ার জন্য। এইভাবে সে কুমন্ত্রণা দিতে দিতে এক সময় হয়ত তোমাকে লোকালয় ত্যাগ করাইয়া কোন বনে-জঙ্গলে নিয়া ছাড়িবে। এখানেই শেষ নহে। এই পর্যায়ে শয়তান তোমাকে পরামর্শ দিয়া বলিবে, আসলে মারেফাত হাসিল করার মধ্যেই মূল আনন্দ। তুমি যদি বিরান ভূমিতে পড়িয়া থাক, আর মানুষ তোমার কঠিন সাধনা ও কামিয়াবীর কথা যদি জানিতে না পারে, তবে তোমার কি লাভ হইবে? সুতরাং কোন উপায়ে মানুষের নিকট তোমার সম্পর্কে এই সংবাদ প্রচার হওয়া আবশ্যক যে, অমুক ব্যক্তি মানুষের ভয়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া বিরান ভূমিতে গিয়া সাধনায় ব্রতী হইয়াছে। এখন বল, শয়তানের আক্রমণ হইতে তুমি কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে? সুতরাং মুক্তির একমাত্র উপায় হইল, রিয়া সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে যে, রিয়া দ্বারা দুনিয়াতে কোন ফায়দা হয় না এবং পরকালের জন্যও উহা ক্ষতিকর। অর্থাৎ শয়তানের প্রতারণা ও রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে যদি এইভাবে নিজের মনকে বুঝাইতে পার, তবে অন্তর হইতে রিয়া দূর হইয়া তদস্থলে এখলাস পয়দা না হওয়ার কোন কারণ নাই। তোমার কাজ হইল, পাবন্দির সহিত নিজের আমলে জমিয়া থাকা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসার কোন পরওয়া না করা। শয়তান তোমার পিছনে লাগিয়া থাকিলেও কোন ভ্রূক্ষেপ করিবে না। কেননা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা তো কোন

দিনই বন্ধ হইবে না। এই ওয়াসওয়াসার কারণেই যদি আমল বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে তো আমলের সেলসেলা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শয়তান যদি তোমার অন্তরে এইরূপ ওয়াসওয়াসা পয়দা করে যে, "তুমি রিয়াকার" তবে মনে করিবে, ইহা শয়তানের প্রতারণা। অর্থাৎ এই সময় যদি তোমার অন্তরে রিয়ার অনিষ্ট এবং উহা অস্বীকার করার শক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে ইহা শয়তানের উক্তি মিথ্যা হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে তোমার অন্তরে যদি রিয়ার অনিষ্ট এবং আল্লাহর ভয় মওজুদ না থাকে, কিংবা তোমার আমলের প্রেরণাদাতা যদি দ্বীন না হয়, তবে এমতাবস্থায় তোমার পক্ষে আমল বর্জন করা কর্তব্য। তবে এমন ঘটনা খুব কমই হইয়া থাকে। কেননা, যেই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আমল শুরু করে, তাহার অন্তরে ছাওয়াবের নিয়ত অবশ্যই থাকিবে।

বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক আমল বর্জনের ঘটনা

কেহ হয়ত বলিতে পারে, আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন খ্যাতির ভয়ে আমল বর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। যেমন– একবার হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সাক্ষাত করিতে আসিলে তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করিয়া দেন। এই ঘটনার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, আগন্তুক যেন জানিতে না পারে যে আমি সর্বদা তেলাওয়াতে মশগুল থাকি।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, যখন তোমার নিকট কথা বলিতে ভাল লাগিবে, তখন চুপ করিয়া থাকিবে। আর চুপ থাকিতে ভাল লাগিলে কথা বলিতে শুরু করিবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, কোন কোন বুজুর্গ পথের উপর কষ্টদায়ক বস্তু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও খ্যাতির ভয়ে তাহা সরাইয়া দিতেন না। আবার কাহারো অবস্থা ছিল এইরূপ– আবেগে কান্না আসিয়া পড়িলে কেবল খ্যাতির ভয়েই হাস্য করিতেন। এই জাতীয় আরো বহু ঘটনা উল্লেখ আছে। সুতরাং এইসব ঘটনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কেমন করিয়া আমল প্রকাশ করাকে উত্তম বলা যাইবে?

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, আমল বর্জন করা সংক্রান্ত উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনা– আমল প্রকাশ না করার জন্য দলীল হইতে পারে না। তা ছাড়া আমল প্রকাশ করারও অসংখ্য ঘটনা মাওজুদ আছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর উক্তি হইতে জানা যায় যে, হাসা ও পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া দেওয়ার মধ্যে খ্যাতির আশংকা বিদ্যমান। অথচ এই উক্তির পরও হযরত হাসান কিন্তু নিজে ঐ দুইটি আমল বর্জন করেন নাই।

মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট এবাদত

যেই সকল এবাদত মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট সেইগুলিতে বিপদাশংকাও বেশী। তবে এইগুলির কোন কোনটিতে বিপদের মাত্রা বেশী আবার কোনটিতে উহার মাত্রা কম। সর্বাধিক বিপদ হইল খেলাফতের মধ্যে। অতঃপর যথাক্রমে শাসক, ইমামতি, বিচারপতি, শিক্ষকতা ও ফতোয়া দানের মধ্যে। খেলাফতের অর্থ হইতেছে মুসলমানদের নেতা হওয়া। এই খেলাফত যদি ইনসাফ, এখলাস এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তবে উহা উত্তম আমল। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

عبادة اليوم من امام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما

অর্থঃ "ন্যায়পরায়ন খলীফার এক দিন, এক ব্যক্তির একাকী ষাট বৎসর এবাদতের সমান।" (তাবরানী, বায়হাকী)

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, এতদ্ অপেক্ষা বড় এবাদত আর কি হইতে পারে যে, একজন ন্যায়পরায়ন বাদশাহর এক দিনের এবাদত ষাট বৎসর এবাদতের সমান। অপর এক হাদীসে আছে–

اول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط احدهم

অর্থঃ "সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ইনসাফকার খলীফা তাহাদের একজন।" (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل احدهم

অর্থঃ "তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ন্যায়পরায়ন খলীফা তাহাদের একজন।" নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন–

اقرب الناس منى مجلسا يوم القيامة امام عادل

অর্থঃ "রোজ কেয়ামতে আমার অধিক নিকটে বসিবে ন্যায়পরায়ণ খলীফা।"

মোটকথা, খেলাফত যেমন একটি মহান এবাদত, তদ্রূপ উহার বিপদাশংকাও বেশী। এই কারণেই বুজুর্গানেদ্বীন সর্বদা এই দায়িত্ব হইতে দূরে ছিলেন। খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা লাভের পর ভোগ-বিলাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং যশপ্রীতি, নেতৃত্ব ও হুকুম খাটানো ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি মন

আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর মনের চাহিদা মিটাইতে গিয়া অনেক সময় সত্য বিষয়ও বর্জন করা হয়। অর্থাৎ নিজের স্বার্থ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা হইলে ন্যায় ও হক বিষয় বর্জন করিয়া অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করা হয় না। এইভাবেই একজন খলীফা জালেম শাসকে রূপান্তরিত হয়। উপরে বর্ণিত হাদীসের মাফহুম দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, জালেম শাসকের একদিন, একজন ফাসেকের ষাট বৎসর পাপকর্মের সমান। এই ভয়াবহ বিপদাশংকার কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন- এই পদে যখন এত বিপদ, তখন ইহা কে গ্রহণ করিবে? নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এই পদের বিপদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইবে। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

ما من وال عشرة الا جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه اطلقه عدله او اوبقه جوره

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি দশ ব্যক্তিরও শাসক হয়, সেই ব্যক্তিও কেয়ামতের দিন এমতাবস্থায় হাজির হইবে যে, তাহার হাত ঘাড়ের সহিত বাঁধা থাকিবে। তাহার ন্যায়পরায়ণতা তাহাকে মুক্ত করিবে কিংবা তাহার জুলুম তাহাকে ধ্বংস করিবে।" (আহমাদ)

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মাকেল ইবনে য়াসারকে কোন প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করার প্রস্তাব করিলে তিনি আরজ করিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এই বিষয়ে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন। আমার পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ কি-না। খলীফা বলিলেন, আমার পরামর্শের উপরই যদি তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে, তবে আমি বলিব, এই দায়িত্ব গ্রহণ না করাই ভাল। আর আমার এই পরামর্শের কথা অপর কাহাকেও বলিও না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করিতে চাহিলে লোকটি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে বলিয়া দিন, শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করা আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি-না। এরশাদ হইলঃ ঠিক আছে, তুমি বস। (তাবরানী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ছামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

يا عبد الرحمن لا تسئل الامارة فانك ان توتيتها من غير مسألة اعنت عليها و ان توتيتها عن مسألة وكلت عليها

অর্থঃ "হে আব্দুর রহমান! শাসক পদ প্রার্থনা করিও না। যদি প্রার্থনা ছাড়াই প্রাপ্ত হও; তবে উহার জন্য তুমি গায়েব হইতে সাহায্য পাইবে। আর যদি প্রার্থনা করার পর পাও, তবে উহার হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে।"

(বোখারী, মুসলিম)

একবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) রাফে' ইবনে ওমরকে বলিলেন, দুই ব্যক্তির উপরও শাসক হইও না। কিন্তু পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন, তখন রাফে' ইবনে ওমর আরজ করিলেন, আপনি তো আমাকে দুই ব্যক্তির উপরও শাসক হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তো আপনি গোটা উম্মতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে এখনো আমি সেই কথাই বলি যে, দুই ব্যক্তির উপরও শাসক হইও না। কেননা, যেই ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হওয়ার পর ইনসাফ করে না, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়।

শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে বারণ এবং উহার প্রতি উৎসাহ প্রদান পরস্পর বিরোধী নহে

উপরের আলোচনা দ্বারা দেখা যায়, কতক হাদীসে শাসক হওয়ার ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। আবার কতক হাদীসে শাসক হইতে বারণ করা হইয়াছে। স্বল্প বিদ্যার লোকেরা হয়ত এইসব বিবরণকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারে। আসলে এইসব বিবরণে কোন বৈপরীত্য নাই। এখানে প্রকৃত অবস্থা হইল, এমন বিশেষ ব্যক্তিবর্গ- দ্বীনের উপর যাহাদের মজবুতী আছে, তাহারা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা উচিৎ নহে। আর দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে যাহারা দুর্বল, তাহারা অবশ্যই উহা হইতে দূরে থাকা উচিৎ। কেননা, এই শ্রেণীর লোকেরা শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিলে দ্বীনের উপর মজবুতী না থাকার কারণেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এমন ব্যক্তিগণই দ্বীনের উপর মজবুত, দুনিয়ার লোভ-লালসা যাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে যাহারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। এই শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না এবং নিজের নফসের কামনা-বাসনাকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহারা শয়তানের প্রতারণার জালকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং শয়তান তাহাদের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রতিটি কর্ম ন্যায় ও সত্যের জন্য নিবেদিত এবং সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেও তাহারা কোন পরওয়া করে না। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে খেলাফত ও শাসনক্ষমতা গ্রহণ করা উচিৎ এবং এই শ্রেণীর লোকদের জন্যই উহার ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাদের মধ্যে

এইসব গুণ নাই, তাহাদের পক্ষে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ নহে।

যেই ব্যক্তি নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে, সে ন্যায় ও সত্যের উপর অটল থাকিতে সক্ষম এবং প্রবৃত্তির চাহিদা হইতে মুক্ত- কিন্তু এই ব্যক্তি এখনো কোন দিন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই; বরং এই বিষয়ে যথেষ্ট আশংকা আছে যে, একবার ক্ষমতার স্বাদ পাইলে উহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে এবং ক্ষমতা হারাইবার আশঙ্কা হইলে সে উহা আঁকড়াইয়া থাকারই চেষ্টা করিবে। এমন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিৎ কি-না এই বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াও তাহা ত্যাগ করা ওয়াজিব নহে। কেননা, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির মধ্যে এমনসব গুণ-বৈশিষ্ট ও যোগ্যতা বিদ্যমান- যাহা একজন ন্যায়পরায়ন খলীফার মধ্যে থাকা আবশ্যক। অবশ্য ভবিষ্যতে তাহার এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হইল, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ হইতে বিরত থাকা উচিৎ। কেননা, মানুষের মন এবং উহার মতিগতির কোন ঠিকঠিকানা নাই। মানুষ সব সময়ই ন্যায় ও সৎ পথে চলার অঙ্গীকার করে। কিন্তু ভবিষ্যতেও সেই অঙ্গীকার বহাল থাকিবে কি-না তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। বরং এই অঙ্গীকার ভঙ্গের আশংকা থাকিয়াই যায়। সুতরাং খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাই সঙ্গত। কেননা, একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উহা বর্জন করা খুবই কঠিন। পদাবনতি যেন মানুষের নিকট মৃত্যুতুল্য কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে- পদ হইতে অপসারণ পুরুষের জন্য তালাকের মত অবমাননাকর। সুতরাং একবার ক্ষমতা গ্রহণের পর কেহই উহা আর হারাইতে চাহে না। বরং উহা আঁকড়াইয়া থাকার জন্য মানুষ সত্য বিষয়ও বর্জন করিয়া জাহান্নামের খড়ি হইতে সম্মত হয়- তবুও ক্ষমতা ও পদ হারাইতে রাজি হয় না।

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা ও পদের জন্য প্রার্থী হইতে এবং উহা লাভ করার জন্য পেরেশান হইতে দেখিলে মনে করিবে, এই ব্যক্তির নেতৃত্বে শুধুই অনিষ্ট নিহিত এবং তাহার দ্বারা কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

انا لا نولى امرنا من سألناه

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি আমার নিকট হুকুমত প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে হাকিম বানাই না।" (বোখারী, মুসলিম)

দ্বীনের ব্যাপারে মজবুতী ও দুর্বলতার উপরোক্ত পার্থক্য জানার পর এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত রাফে ইবনে ওমরকে কি কারণে শাসনভার গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কি কারণে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিচারক

বিচারকের পদটি শাসনকর্তার নিম্নে অবস্থিত হইলেও উহার বিধানও শাসনকর্তার মতই। কেননা, ইহাতেও শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান এবং বিচারকের ফায়সালাও বাস্তবায়ন করা হয়। বিচারকের পদে বসিয়া যদি ইনসাফ ও সত্যের অনুসরণ করা হয়, তবে ইহা একটি অতিবড় ছাওয়াবের কাজ। আর এই ক্ষমতা বলে যদি অন্যায় ও অবিচার করা হয়, তবে ইহার আজাবও কঠিন। রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন-

القضاة ثلاثة، قاضيان في النار و قاض في الجنة

অর্থঃ "বিচারক তিন প্রকার। উহার মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে এবং দুই প্রকার জাহান্নামে যাইবে।" (আসহাবে সুনান)

অপর এক হাদীসে আছে-

من استقضى فقد ذبح بغير سكين

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি নিজে বিচারক হওয়ার আবেদন করে, সে ছুরি ছাড়াই জবাই হইয়া যায়।" (আসহাবে সুনান)

মোটকথা, দ্বীনের মধ্যে যাহাদের মজবুতী নাই এবং এমন সব ব্যক্তি যাহাদের নজরে দুনিয়া এবং উহার স্বাদ-সম্ভোগের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আছে তাহাদের পক্ষে বিচারকের পদ গ্রহণ করা উচিৎ নহে। পক্ষান্তরে দ্বীনের মধ্যে যাহাদের মজবুতী আছে এবং ন্যায় ও সত্যের ক্ষেত্রে যাহারা তিরস্কারকের তিরস্কারকে কিছুমাত্র ভয় করে না, তাহারা এই পদ গ্রহণে সম্মত হওয়া উচিৎ।

বাদশাহ যদি জালেম হয় এবং বিচারক যদি ইহা জানিতে পারে যে, বিচারকার্য পরিচালনায় সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, বাদশাহর মর্জিরই অনুসরণ করিতে হইবে এবং বাদশাহর আপন জন ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কারণেই অনেক সময় বিচারের সঠিক ফায়সালা এড়াইয়া যাইতে হইবে এবং এইভাবে চলিতে পারিলেই এই পদে বহাল থাকা যাইবে। তদুপরি বিচারকের যদি ইহাও জানা থাকে যে, আমি যদি বাদশাহ ও তাহার আমলাদের কোন মোকদ্দমায় ন্যায়বিচার করি, তবে তাহারা আমাকে বরখাস্ত করিয়া দিবে কিংবা তাহারা আমার ফায়সালা মানিবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকের পদ গ্রহণ না করাই উচিৎ। আর এইরূপ ক্ষেত্রেও যদি বিচারকের পদ গ্রহণ করা হয়, তবে তাহার কর্তব্য হইল- বাদশাহ ও তাহার আমলাগণকে হক ও ন্যায়ের ফায়সালা

মানিতে বলিবে এবং বিচারকের পদ হারাইবার আশংকা করিবে না। বরং ন্যায়ের পথে অটল থাকার কারণে পদচ্যুত হইলে মনে করিবে, আল্লাহ পাক মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন বিচারক পদচ্যুত হওয়ার কারণে যদি মনে কষ্ট অনুভব করে এবং পদ রক্ষার জন্য যদি ন্যায় বিচারের কোন পরওয়া না করে তবে এই ব্যক্তি প্রকৃত বিচারক নহে। বরং এই ব্যক্তি নফসের খাহেশাতের পুজারী ও শয়তানের অনুসারী। বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে এই ব্যক্তি কোন ছাওয়াব তো পাইবেই না, বরং জালেমদের সঙ্গে দোজখের নিম্নস্তরে অবস্থান করিবে।

ওয়াজ, ফতোয়া ও শিক্ষকতা

ওয়াজ, ফতোয়া প্রদান, হাদীছ বর্ণনা ও শিক্ষকতার মধ্যেও যশ-খ্যাতি ও মর্যাদা প্রাপ্তির উপাদান বিদ্যমান বিধায় এই ক্ষেত্রেও খেলাফত ও শাসন ক্ষমতার মতই বিপদাশংকা বিদ্যমান। এই বিপদাশংকার কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অনেকে যথাসম্ভব এইসব কাজ হইতে বিরত থাকিতেন।

হযরত বিশর (রাঃ) কয়েক আলমিরা হাদীস দাফন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি এই কারণে হাদীস বর্ণনা করি না যে, আমার মন হাদীস বর্ণনা করিতে ভালবাসে। আমার মনে যদি হাদীস বর্ণনা করার বাসনা পয়দা না হয়, তবে অবশ্যই আমি হাদীস বর্ণনা করিব। একজন ওয়ায়েজ যখন জানিতে পারে যে, তাহার ওয়াজের প্রভাবে শ্রোতাগণ আবেগ-আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে এবং আজাব ও গজবের বয়ানের কারণে শ্রোতাদের মধ্যে আহাজারী ও ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইতেছে তখন সে এমন এক অনাবিল আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করে যে, উহার সঙ্গে অপর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। এই শ্রেণীর ওয়ায়েজগণ কেবল এমন ওয়াজ করিয়া বেড়ায় যাহা শুনিয়া মানুষ আনন্দ পায়– যদিও তাহা ভ্রান্ত হয়। আর যেইসব ওয়াজ শুনিয়া মানুষ তৃপ্ত হয় না তাহা আবশ্যকীয় ও জরুরী হইলেও সেইগুলি পরিহার করিয়া চলে। অর্থাৎ এইসব ওয়ায়েজগণ কেবল সুনাম-সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যেই শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী ওয়াজ করিয়া বেড়ায়। কোথাও কোন হাদীস ও হেকমতের কথা পাইলে এই কারণে আনন্দিত হয় যে, এখন আমি এই হাদীস ও হেকমতের কথা বয়ান করিয়া শ্রোতাদের বাহ্বা কুড়াইব। অথচ তাহার উচিৎ ছিল এই ভাবিয়া আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমি একটি মূল্যবান হাদীস এবং একটি হেকমতের কথা জানিতে পারিয়াছি। এখন আমি প্রথমে নিজে উহার উপর আমল করিব এবং পরে আল্লাহ তাওফীক দিলে অপর ভাইদের নিকটও উহা পৌঁছাইয়া দিব যেন তাহারাও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে।

মোটকথা, ওয়াজ-নসীহত ও শিক্ষকতা ইত্যাদির মধ্যেও শাসনক্ষমতার মত ফেৎনার আশংকা বিদ্যমান এবং এই ওয়াজ-নসীহত ও শিক্ষকতার হুকুমও শাসনক্ষমতার অনুরূপ। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি নিছক যশ-খ্যাতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহতের সুযোগ সন্ধান করে এবং উহাকে জীবিকার মাধ্যম বানায়, তাহার উচিৎ যতদিন তাহার অন্তরে খাহেশাতের পরিবর্তে আখেরাতের ভয় প্রবল না হইবে ততদিন এইসব কর্ম হইতে বিরত থাকা।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আলেম সমাজকে যদি ওয়াজ-নসীহত, ফতোয়া ও শিক্ষকতা ইত্যাদি হইতে বিরত রাখা হয়, তবে তো দুনিয়া হইতে এলেম নিশ্চিহ্ন হইয়া খায়ের ও কল্যাণের ধারা বন্ধ হইয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবী জেহালাত ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া ধর্মীয় চেতনা ও সভ্যতার অবসান ঘটিবে। এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ক্ষমতা ও রাজত্বের অনিষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি এরশাদ করিয়াছেন–

انكم تحرصون على الامارة و انها حسرة و ندامة يوم القيامة الا من اخذها بحقها .

অর্থঃ "তোমরা রাজত্বের লোভ করিতেছ, অথচ কেয়ামতের দিন উহা দুঃখ ও লজ্জার কারণ হইবে। তবে যেই ব্যক্তি উহাকে সৎ উপায়ে গ্রহণ করে (তাহার জন্য দুঃখ ও লজ্জার কারণ নাই)"। (বোখারী)

ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন যদি দুর্বল হইয়া যায়, তবে দ্বীন-দুনিয়ার সব কিছুতেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং দেশব্যাপী চরম অরাজকতা ও হানাহানি সৃষ্টি হইয়া দেশ হইতে শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পার্থিব জীবন ও জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন আছে। অথচ এতদ্সত্ত্বেও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজত্ব ও ক্ষমতার পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) শুধু এই কারণে উবাই ইবনে কা'বকে তিরস্কার করিয়াছিলেন যে, তাহার গোত্রের কতক লোক তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছিল। অথচ উবাই ইবনে কা'ব সম্পর্কে তিনি নিজেই বলিতেন যে, উবাই মুসলমানদের নেতা। হযরত ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে কোরআন শরীফ শোনাইতেন। সেই উবাই ইবনে কাবের পিছনে কতক ব্যক্তিকে অনুগামী হইতে দেখিয়া তিনি বাঁধা দিয়া বলিলেন, এখানে যাহারা আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে তাহাদের জন্য উহা অপমানের কারণ হইবে এবং

যাহার আনুগত্য করা হইতেছে তাহার জন্য ফেৎনার আশংকা রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) খোৎবা দিতেন এবং লোকসমাগমে ওয়াজ নসীহত করিতেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহার নিকট প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর ওয়াজ করার অনুমতি চাহিলে তিনি লোকটিকে বারণ করিয়া বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছে যে, উহার কারণে তুমি ফুলিয়া উঠিবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই উক্তির কারণ হইল, সেই ব্যক্তির মধ্যে যশ-প্রীতি ও জনপ্রিয় হওয়ার আগ্রহ বিদ্যমান ছিল।

মোটকথা, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষকতা ও ফতোয়া যেমন দ্বীনের জন্য আবশ্যক, তদ্রূপ মানুষের দ্বীনের হেফাজতের জন্যও খেলাফত ও বিচারকের প্রয়োজন রহিয়াছে। জাগতিক বিবেচনায় এই দুইটি ক্ষেত্র যেমন লোভনীয়, তদ্রূপ উহাতে বিপদাশংকাও যথেষ্ট বিদ্যমান। এই হিসাবে এই দুইটি ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং প্রশ্নকর্তার এই উক্তি সঠিক নহে যে, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষকতা ও ফতোয়া হইতে বিরত রাখা হইলে দ্বীন মিটিয়া যাইবে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। এখন তাহার এই নিষেধবাণীর কারণে কি বিচার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল? বরং বাস্তব অবস্থা তো এই কথাই স্বাক্ষ্য দেয় যে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মোহ মানুষকে বিচারক পদের প্রার্থী হইতে বাধ্য করিয়াছিল। অনুরূপভাবে যশ-খ্যাতি ও নেতৃত্বের মোহের কারণেই মানুষ এলেম মিটাইতে দিবে না। বরং মানুষের পায়ে বেড়ী লাগাইয়া বন্দী করিয়াও যদি তাহাদিগকে এলেমের অন্বেষণ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়, তবুও তাহা সম্ভব হইবে না। মানুষ যে কোন উপায়ে এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া এলেমের অন্বেষণ ও দ্বীন শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিবেই। আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি এমন লোক দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করাইবেন– দ্বীনের মধ্যে যাহাদের কোন অংশ নাই। সুতরাং তোমরা মানুষের চিন্তা করিও না। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। তোমরা বরং নিজেদের ফিকির কর যেন তোমরা নিজেরা ধ্বংস হইয়া না যাও।

মনে কর, কোন শহরে যদি বেশ কিছু সংখ্যক ওয়ায়েজ থাকেন, আর তাহাদিগকে ওয়াজ করিতে নিষেধ করা হয়, তবে খুব স্বল্প সংখ্যক ওয়ায়েজই এই নিষেধাজ্ঞা পালন করিবেন এবং অধিকাংশ ওয়ায়েজই যশ-খ্যাতি, সম্মান ও ক্ষমতার মোহে ওয়াজ-নসীহত চালাইয়া যাইবেন। তবে গোটা শহরে যদি কেবল একজন ওয়ায়েজই থাকেন এবং তাহার আকর্ষণীয় ওয়াজ যদি মানুষের জন্য উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সেই সঙ্গে যদি ইহাও মনে করা হয় যে, এই ব্যক্তি নেহায়েত এখলাসের সঙ্গেই ওয়াজ করেন এবং পার্থিব

লোভ-লালসার সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তবে এইরূপ ব্যক্তিকে কেহই ওয়াজ করিতে নিষেধ করিবে না। বরং সকলেই তাহাকে বলিবে যে, আপনি নিয়মিত ওয়াজ চালাইয়া যান। এই ব্যক্তি যদি এই কথা বলিয়া নিজের অপারগতা প্রকাশ করে যে, আমি আমার নফস ও প্রবৃত্তির ব্যাপারে নিশ্চিত নহি, তবুও লোকেরা তাহাকে বলিবে যে, আপনি ওয়াজ-নসীহত করিতে থাকুন এবং সেই সঙ্গে নফসের এস্‌লাহের জন্য মোজাহাদা করিতে থাকুন, তবুও ওয়াজ বন্ধ করিবেন না। কেননা, এই ক্ষেত্রে লোকেরা মনে করিবে যে, এই একমাত্র ব্যক্তিটি যদি তাহার ওয়াজ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে শহরের লোকেরা দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া ক্রমে বিপথগামী হইতে থাকিবে। কারণ, এই জনপদের মানুষকে ধর্মের পথ দেখাইবার মত দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি নাই। এই ব্যক্তি যদি যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য ওয়াজ করিতে থাকে এবং উহার পরিণতিতে সে ধ্বংস হইয়া যায়, তবুও লোকেরা উহার কোন পরওয়া করিবে না। কেননা, লোকেরা এই এক ব্যক্তির দ্বীনের নিরাপত্তার তুলনায় সকলের দ্বীনের নিরাপত্তার বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দিবে। মানুষ মনে করিবে, আমরা শহরের সকল অধিবাসীদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য এই ব্যক্তিকে না হয় উৎসর্গ করিলাম। কেননা, এই ব্যক্তির ওয়াজ-নসীহতের অনুসরণের মাধ্যমেই সকলের পারলৌকিক জীবন দুরস্ত হইবে। সম্ভবতঃ এই ধরনের লোকদের সম্পর্কেই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم

অর্থঃ "আল্লাহ পাক এমন লোকদের দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করাইবেন, দ্বীনের মধ্যে যাহাদের কোন অংশ নাই।" (নাসাঈ শরীফ)

ওয়ায়েজের সংজ্ঞা

প্রকৃত অর্থে ওয়ায়েজ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যিনি নিজের কথা, কর্ম ও বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা মানুষকে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে এবং ব্যক্তি জীবনের সর্ব অঙ্গনে নিজে তাকওয়া ও পরহেজগারীর অনুসারী হয়। কিন্তু হাল জমানার ওয়ায়েজগণ কেবল ভাষা ও চটকদার বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমেই মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালায়। আলোচনার ফাকে ফাকে সুমধুর কণ্ঠে শের-বয়াত পাঠ করিয়া শ্রোতাগণকে মাতাইয়া রাখার চেষ্টা করা হয়। এইসব কুশলী বয়ানকে চমৎকার ওয়াজ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা না দ্বীনের কোন ফায়দা হয়, না দ্বীনদারদের আত্মিক কোন উপকার হয়। আর না মুসলমানদের অন্তরে আখেরাতের ভয় পয়দা হয়। বরং এইসব পোশাকী ওয়াজের ফলে মানুষের অন্তরে পাপাচারের দুঃসাহস এবং খাহেশাতের আকাঙ্ক্ষাই বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের ওয়ায়েজগণকে শহর হইতে তাড়াইয়া

দেওয়া উচিত। ইহারা দাজ্জালের নায়েব ও শয়তানের খলীফা। অর্থাৎ এইসব ওয়ায়েজগণের পরিচয় হইল– তাহাদের কথা, বর্ণনাভঙ্গি, উপস্থাপনা ও বাহ্যিক ছুরত খুবই চমৎকার বটে, কিন্তু ওয়াজের মাধ্যমে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে শুধুই যশ-খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্তি। আমার রচিত "কিতাবুল ইলম" শীর্ষক পুস্তিকায় "ওলামায়ে ছু' বা এই ধরনের অসৎ আলেমদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এই শ্রেণীর আলেম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, হে ওলামায়ে ছু! তোমরা রোজা-নামাজ ও দান-সদকা কর, কিন্তু মানুষকে যাহা করিতে বল, নিজেরা উহার উপর আমল কর না। মানুষকে সৎ পথে চলার উপদেশ দাও কিন্তু নিজেরা ন্যায় ও সত্যের বিপরীতে অবস্থান করিতেছ। তোমরা মুখে তওবা কর বটে, কিন্তু অন্তরে নফসের খাহেশাতের আনুগত্য কর। তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা যতই সুন্দর হউক, কিন্তু তোমাদের অন্তর যদি পবিত্র না হয়, তবে তোমরা কেমন করিয়া মঙ্গলের আশা করিতে পার? আমি সত্য বলিতেছি! তোমরা এমন চালনিতে পরিণত হইও না, যেই চালনি হইতে ভাল আটাগুলি বাহির হইয়া উহাতে কেবল ভুসিগুলি অবশিষ্ট থাকে। তোমাদের অবস্থা কিন্তু সেইরূপই মনে হইতেছে। তোমাদের মুখ হইতে হেকমতের কথা বাহির হইয়া অন্তরে যাহা অবশিস্ট থাকে উহা শুধুই নেফাক ও কপটতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হে দুনিয়ার গোলামগণ! যেই ব্যক্তি এখনো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও খাহেশাত ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং সর্বদা কেবল দুনিয়ার পিছনেই ছুটিতেছে, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া পরকালে লাভবান হইবে? আমি সত্য বলিতেছি! তোমাদের অন্তর তোমাদের আমলের অবস্থা দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছে। দুনিয়াকে তোমরা জিহ্বার নীচে রাখিয়া আমলকে পায়ের নীচে দলিত করিতেছ। দুনিয়াকে সজ্জিত করিয়া আখেরাতকে বরবাদ করিতেছ। পরকালের তুলনায় পার্থিব মঙ্গলকেই তোমরা অধিক প্রিয় মনে করিতেছ। সুতরাং তোমাদের তুলনায় হতভাগা আর কে হইতে পারে? হায় আফসোস! তোমরা যদি নিজেদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে জানিতে পারিতে! আর কতকাল তোমরা অন্ধকারের পথচারীকে পথ দেখাইবে, আর নিজেরা উদভ্রান্তের মত দাঁড়াইয়া থাকিবে? তোমরা যেন ইহাই কামনা করিতেছ যে, দুনিয়াদারগণ তোমাদের জন্য দুনিয়া রাখিয়া চলিয়া যায় আর তোমরা উহা ভোগ করিতে থাকিবে। এইবার ক্ষান্ত হও, আর অগ্রসর হইও না। তোমরা কি ইহা জান না যে, যেই ব্যক্তি ঘরের ছাদের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে, তাহার ঘরের অন্ধকার কখনো দূর হয় না? তোমাদের এলেমের নূর যদি তোমাদের মুখেই থাকে, আর তোমাদের অন্তর সেই নূরের কোন অংশ না পায়, তবে এমন এলেম দ্বারা তোমাদের কি লাভ হইবে? হে দুনিয়ার গোলামগণ! তোমরা না মোত্তাকী বান্দা, আর না তোমরা গাইরুল্লাহর গোলামীর জিঞ্জির হইতে মুক্ত হইয়া সভ্য মানুষ হইতে পারিয়াছ। তোমাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন দুনিয়া তোমাদিগকে নীতিচ্যুত করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিবে। তোমাদের গোনাহ তোমাদের কপালের চুল টানিয়া ধরিয়া এবং এলেম পিছন হইতে ধাক্কা দিয়া প্রকৃত বাদশাহর নিকট সোপর্দ করিবে। তোমাদের মাথায় না টুপি থাকিবে, না পায়ে জুতা থাকিবে। অতঃপর তোমাদের পাপাচার সম্পর্কে অবহিত করিয়া উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

হযরত হারাস মুহাসাবী নিজের এক কিতাবে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করার পর লিখেনঃ এইসব "ওলামায়ে ছু" হইল মানবরূপী শয়তান এবং মানুষের জন্য ইহারা এক ফেৎনা। ইহারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও পার্থিব ইজ্জত-সম্মানের প্রতি আকৃষ্ট এবং আখেরাতের উপর দুনিয়ার শান-শওকতকেই প্রাধান্য দেয়। সকল ক্ষেত্রেই তাহারা দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে অপমান করিয়াছে। এইসব লোকেরা দুনিয়াতেও অপমানিত হইয়াছে এবং তাহাদের আখেরাতও বরবাদ হইবে।

এখন কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, আমরা না হয় দুনিয়ার এই সব বাহ্যিক বিপদাপদ মানিয়া লইলাম। কারণ, হাদীস শরীফে তো ওয়াজ নসীহতের বহু ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لان يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا و ما فيها

অর্থঃ তোমার দ্বারা যদি এক ব্যক্তি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তবে তোমার জন্য উহা দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।" (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীস এইরূপ–

ايما داع دعا الى هدى و اتبع عليه كان له اجبره و احبر من اتبعه

অর্থঃ "যেই দায়ী' দাওয়াত দেয় এবং লোকেরা তাহার অনুসরণ করে, তবে দায়ী' ইহার ছাওয়াব পাইবে এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিবে উহার ছাওয়াবও পাইবে। (ইবনে মাজা)

এলেমের ছাওয়াব ও ফজিলত সংক্রান্ত এই ধরনের বহু রেওয়ায়েত উল্লেখ আছে। সুতরাং একজন আলেমকে এই পরামর্শ দেওয়া উচিৎ যেন সে নিজের এলেম বর্জন না করিয়া বরং উহাতে নিমগ্ন থাকে এবং মানুষের মঙ্গলার্থে রিয়া বর্জন করিয়া চলে। যেমন একজন রিয়াকার নামাজীকে বলা হয় যে, তুমি আমল বর্জন না করিয়া বরং উহা সম্পন্ন কর এবং রিয়া হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য

চেষ্টা করিতে থাক।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিব, এলেমের ফজিলত যেমন অপরিসীম তদ্রূপ উহার বিপদাশংকাও কম নহে। যেমন খেলাফত ও রাষ্ট্রক্ষমতা উত্তম আমলের বাহন বটে, কিন্তু উহার বিপদাশংকাও ভয়াবহ। আমরা আল্লাহর কোন বান্দাকে এই কথা বলি না যে, এলেম বর্জন কর। কারণ, সত্ত্বাগতভাবে এলেমের মধ্যে কোন বিপদ নাই। বিপদ হইল, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষকতা ও হাদীস বর্ণনায় উহা জাহির করার ক্ষেত্রে। সুতরাং কাহারো অন্তরে যদি রিয়ার পাশাপাশি এলেমও মওজুদ থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রেও আমরা আমল বর্জন করিতে বলিব না। বরং এই ক্ষেত্রেও এলেম জাহির করিয়া দেওয়া উচিৎ। কিন্তু শুধুই রিয়ার কারণে যদি আমল করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে এলেম জাহির না করাই উত্তম ও নিরাপদ। নফল নামাজের বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি শুধু রিয়ার কারণেই নফল নামাজ পড়ে, তবে এই নামাজ বর্জন করা উচিৎ। তবে এই রিয়া যদি নামাজ পাঠরত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্তরে রিয়ার প্রতি ঘৃণাও থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে নামাজ ত্যাগ করিবে না। কেননা, এবাদতের মধ্যে রিয়ার বিপদ তুলনামূলকভাবে দুর্বল। আর হুকুমত, রাজত্ব ও এলেমের সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদমর্যাদা সমূহের ক্ষেত্রে উহার বিপদাশংকা অধিক ও শক্তিশালী।

এখলাস ও সততার পরিচয়

একজন আলেম ও ওয়ায়েজের মধ্যে এখলাস ও সততা আছে কি-না এবং তিনি রিয়া হইতে মুক্ত কি-না তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? মোটামুটি কয়েকটি আলামত দ্বারা এই বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কোন আলেম বা ওয়ায়েজের নিকট যদি এমন কোন আলেম বা ওয়ায়েজ আসেন যিনি এই ব্যক্তির তুলনায় ভাল আলেম ও ভাল ওয়ায়েজ, তবে এহেন আলেম ও ওয়ায়েজের আগমনের ফলে এই ব্যক্তি যদি খুশী হয় এবং কোনরূপ হিংসা না করে, তবে এই ব্যক্তির এখলাস ও সততা প্রমাণিত হইবে। অবশ্য হিংসার পরিবর্তে যদি ঈর্ষা হয় তবে কোন ক্ষতি নাই। ঈর্ষা বলা হয়– কাহারো মধ্যে কোন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়া নিজেও সেইরূপ হওয়ার প্রত্যাশী হওয়া। ইহা দোষনীয় নহে।

আরেক লক্ষণ হইল, ওয়াজ করার সময় যদি বড় কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার ওয়াজের ধরণ পরিবর্তন না করিয়া আগের মতই ওয়াজ করিতে থাকা। অর্থাৎ সকল মানুষই তাহার নজরে বরাবর হওয়া। ইহাও বক্তার সততা ও এখলাসের আলামত। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ প্রত্যাশা না করা যে, পথে-ঘাটে লোকেরা তাহার পিছনে পিছনে চলিতে থাকিবে। মোটকথা ওয়ায়েজ ও আলেমের এখলাস ও সততার পরিচয় পাওয়ার আরো

অসংখ্য আলামত আছে। এখানে নমুনা হিসাবে উহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইল।

হযরত সাঈদ ইবনে মারওয়ান বলেন, একবার আমি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সম্মুখে বসা ছিলাম। এমন সময় মসজিদের এক দরজা দিয়া হাজ্জাজ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহার সঙ্গে একদল নিরাপত্তা প্রহরীও ছিল। হাজ্জাজ চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, হযরত হাসান বসরীর মজলিসে যেই পরিমাণ শ্রোতা বসা আছে, অপর কোন মজলিসে সেই পরিমাণ শ্রোতা নাই। অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবেই হযরত হাসানের মজলিসের দিকে আগাইয়া আসিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হাজ্জাজকে এদিকে আসিতে দেখিয়া বক্তৃতা অব্যাহত রাখিয়াই একটু সরিয়া নিজের পাশে কিছুটা জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। হযরত সাঈদ বলেন, আমিও তাহার জন্য সামান্য জায়গা ছাড়িয়া সরিয়া বসিলাম। অতঃপর হাজ্জাজ আসিয়া আমাদের উভয়ের মাঝে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হাজ্জাজের আগমনের ফলে হযরত হাসান কিছুমাত্র প্রভাবিত হইলেন না এবং আগের মতই বয়ানের ধারা অব্যাহত রাখিলেন। আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, হযরত হাসান নিশ্চয়ই এখন বয়ানের প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করিবেন যেন উহার ফলে হাজ্জাজের নৈকট্য লাভ করা যায়। কিংবা হাজ্জাজের ভয়ে হয়ত কথা সংক্ষেপ করিবেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরীর মধ্যে এইসবের কোন কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। বরং তাহার আলোচনার ধারা দেখিয়া ইহাই মনে হইল যে, তিনি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে, আজ তাহার পাশে কে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন। অবশেষে যথাসময় বয়ান শেষ হইলে হাজ্জাজ হযরত হাসানের কাঁধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, শায়েখ যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য ও যথার্থ এবং তিনি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি শ্রোতা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! এমন মজলিসেই বসা উচিৎ। আজ তোমরা এখানে যাহা শুনিলে উহা যেন তোমাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان مجالس الذكر رياض الجنة

অর্থঃ "নিশ্চয়ই জিকিরের মজলিস হইল জান্নাতের বাগান।"

অতঃপর হাজ্জাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা তো সবসময় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকি। এই কারণে তোমরা আমাদের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ পাইয়াছ। অন্যথায় তোমাদের তুলনায় আমরাই এইসব মজলিসে অধিক অংশ গ্রহণ করিতাম। কেননা, এইসব মজলিসের গুরুত্ব

আমাদের ভালভাবেই জানা আছে। এই কথা বলার পর তিনি একটু মৃদুহাস্য করিলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক জ্ঞানগর্ভ বয়ান করিলেন যে, তাহার বয়ান শুনিয়া হযরত হাসানসহ সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। বয়ান শেষ করার পরই হাজ্জাজ মজলিস হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে এক বৃদ্ধের আগমন ঘটিল। লোকটি ছিল সিরিয়ার অধিবাসী। ইতিপূর্বে হাজ্জাজ যেখানে দাঁড়াইয়া বয়ান করিয়াছিলেন, লোকটি সেখানে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, হে মুসলমানগণ! তোমরা কি এই কথা জানিয়া বিস্মিত হইবে না যে, আমি একজন বয়োবৃদ্ধ দুর্বল মানুষ, কিন্তু সব সময় আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হয়। যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ও তাবু আমার খুবই প্রয়োজন। আমার নিকট তিনশত দেরহাম আছে- যাহা লোকেরা আমাকে দান করিয়াছে। ঘরে আমার সাতটি কন্যা। তাহাদের ভরণ-পোষণের আয়োজনও আমাকেই করিতে হয়। আর কন্যাদের ভবিষ্যতের ভাবনা তো আছেই। অর্থাৎ এইভাবে সে নিজের অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার কথা এমনভাবে বর্ণনা করিল যে, উহা শুনিয়া হযরত হাসানসহ অন্য সকলে যারপর নাই মর্মাহত হইল। এতক্ষণ হযরত হাসান মস্তক নত করিয়াছিলেন। লোকটির বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হায় আক্ষেপ! আমীরগণ আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের বিনাশ হউক। তাহারা মনে করিয়াছে, তাহাদের নিকট যেই সম্পদ গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, উহা তাহাদেরই সম্পদ। মানুষের নিকট হইতে সম্পদ আহরণের জন্য তাহারা যুদ্ধ করে। শত্রুগণ আসিয়া যখন চড়াও হয়, তখন তাহারা মূল্যবান তাবুর নীচে বসিয়া আরাম করিতে থাকে। দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাহারা ভ্রমণ করে। আর যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের ঘোড়া ও তাবুর কোন ব্যবস্থা হয় না। অর্থাৎ এইভাবে তিনি শাসক শ্রেণীর সমালোচনা করিয়া তাহাদের ত্রুটিসমূহ তুলিয়া ধরিলেন। এই সময় মজলিস হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া গিয়া হাজ্জাজের নিকট হযরত হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, তিনি প্রশাসনের সমালোচনা করিয়া জনগণকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছেন। উহার কিছুক্ষণ পরই শাহী দূত আসিয়া হযরত হাসানকে জানাইল যে, হাজ্জাজ আপনাকে তলব করিয়াছেন। শাহী ফরমান পাইয়া হযরত হাসান সঙ্গে সঙ্গে রওনা হইলেন।

হযরত সাঈদ বলেন, এই সময় আমরা আশংকা করিতেছিলাম যে, হাজ্জাজ হয়ত হযরত হাসানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিবে এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবে। কিছুক্ষণ পরই হযরত হাসান সহাস্য বদনে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তাঁহাকে এমন উৎফুল্ল দেখা যায় নাই। অতঃপর তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া এক আবেগময় ভাষণ দিলেন। প্রথমেই তিনি আমানতের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করিয়া বলিলেন, তোমরা যেখানেই উপবেশন কর, একজন আমানতদার হিসাবেই অবস্থান কর। তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ, কেবল টাকা-পয়সার মধ্যেই খেয়ানত হয়। অথচ সবচাইতে কঠিন খেয়ানত হইল- এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিয়া বসিল, আমরা তাহাকে আমানতদার ও বিশ্বস্ত মনে করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সে চোগলখোরী করিয়া আমাদের কথা অন্যের নিকট গিয়া লাগাইল। হাজ্জাজ আমাকে তলব করার পর আমি তাহার নিকট গিয়া হাজির হইলাম। সে আমাকে বলিলঃ তুমি বেলাগাম কথা বলিও না এবং সাধারণ মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিও না। অবশ্য মানুষের বিরোধিতার আমি কিছুমাত্র পরওয়া করি না বটে। যাহাই হউক, ঘটনাটি আর সামনে আগাইল না এবং এখানেই উহার সমাপ্তি ঘটিল।

একবার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) গাধার উপর সওয়ার হইয়া বাড়ী যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পিছনে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, এক দল মানুষ তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে। তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকেরা কি কারণে আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে? আমার নিকট কি তাহাদের কোন প্রয়োজন আছে? কিংবা তাহারা কি আমার নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবে? তাহারা যদি অকারণেই আমার পিছনে আসিয়া থাকে, তবে তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ। কেননা, এইভাবে কাহারো অনুগামী হওয়া সেই ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

উপরে যেই সমস্ত লক্ষণের বিবরণ দেওয়া হইল, উহা দ্বারা মোটামুটিভাবে মানুষের বাতেনী অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাইবে। তুমি যখন দেখিতে পাইবে যে, আলেমগণ একে অপরকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না এবং পরস্পরে অবর্গ ও বৈরীভাব পোষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মিল-মোহাব্বত ও সৌহার্দ ভাব উঠিয়া গিয়াছে, তখন মনে করিবে যে, তাহারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন ক্রয় করিয়া লইয়াছে। আয় আল্লাহ! তুমি আপন মহিমা দ্বারা আমাদের উপর রহম কর।

অপরকে দেখিয়া আমলে উৎসাহিত হওয়া

অনেক সময় মানুষ হয়ত এমন কতক লোকের সঙ্গে রাত যাপন করার সুযোগ হয়, যাহারা হয়ত তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়া নামাজ পড়ে বা তাহাদের কতক হয়ত সারা রাতই নামাজ পড়ে। কিংবা কেহ কেহ হয়ত রাতের সামান্য সময় নিদ্রা গ্রহণের পর অবশিষ্ট সময় পুরাপুরি নামাজে রত থাকে। এখন সকলকে এবাদত করিতে দেখিয়া এই ব্যক্তির মধ্যেও হয়ত আগ্রহ পয়দা হয় যে, আমিও তাহাদের মত এবাদত করিব। ইতিপূর্বে হয়ত তাহার রাত জাগরণের মোটেও অভ্যাস ছিল না। এখন অন্য মানুষের দেখাদেখি এই ব্যক্তিও

নিজের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া রাতের কিছু অংশ বা গোটা রাত নামাজ পড়িতে লাগিল। অনুরূপভাবে কোন সময় হয়ত রোজাদারদের সঙ্গে এক সাথে থাকার সুযোগ হইল এবং তাহাদের দেখাদেখি এই ব্যক্তিও রোজা রাখিতে শুরু করিল। অথচ এই রোজাদারদের সংস্রবে না আসিলে সে হয়ত কিছুতেই রোজা রাখিত না। সাধারণতঃ এই জাতীয় আমলের উপর রিয়ার হুকুম লাগানো হয় এবং বলা হয়– এই ধরনের আমল বর্জন করা ওয়াজিব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধরনের আমলকে পুরাপুরি রিয়া বলা যাইবে না। বরং ইহা একটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়।

প্রতিটি মুসলমানের অন্তরেই রোজা-নামাজ, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি এবাদতের প্রতি কিছু না কিছু আগ্রহ অবশ্যই থাকে। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকের কারণে হয়ত সেই আগ্রহ বাস্তবায়িত হইতে পারে না। যেমনঃ নফসানী খাহেশাতের প্রাবল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততা কিংবা নিছক গাফলতের কারণেই হয়ত মনের সেই আগ্রহ পুরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন কোন সময় হয়ত অপর কাহাকেও এবাদত করিতে দেখিয়া মনের সেই গাফলত ভাব ও কর্মব্যস্ততা দূর হইয়া এবাদতের প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠে।

মানুষ যখন নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে, তখন যেই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কারণে মন এবাদতের প্রতি আগ্রহী হয় না, সেইগুলির উদাহরণ– হয়ত নরম বিছানায় শুইয়া আরাম করিতেছে, বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প-গুজবে বিনোদনরত, ব্যবসার হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ যখন প্রবাসে থাকে, তখন আর এইসব ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধক থাকে না। তখন হয়ত এমন কিছু উপাদান জুটিয়া যায় যে, উহার ফলে নেক আমলের প্রতি মনে আগ্রহ পয়দা হয়। যেমন সে হয়ত দেখিল, সঙ্গের লোকেরা গভীর মনোযোগের সহিত আল্লাহর এবাদত করিতেছে। এখন প্রবাসের এই নিরিবিলি সময়ে তাহার আশেপাশেও যেহেতু নফসের খাহেশাতে লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কোন উপাদানও মওজুদ নাই; সুতরাং সঙ্গীদের এবাদত দেখিয়া তাহার মনেও এবাদতের প্রতি আগ্রহ পয়দা হওয়া স্বাভাবিক। বরং এই সময় সঙ্গের লোকেরা এবাদতে অগ্রগামী হইয়া গেলে নিজেকে সে হতভাগ্যই মনে করিবে। তো এই জাতীয় এবাদত রিয়ার কারণে হয় না। বরং এবাদতের প্রতি নির্ভেজাল আগ্রহ এবং দ্বীনী জযবার কারণেই হইয়া থাকে।

অনেক সময় মানুষ নূতন কোন জায়গায় গেলে ঘুম আসে না। তখন সে এই অবসরটিকে গনীমত মনে করিয়া এবাদতে নিমগ্ন হয়। নিজের বাড়ীতে হয়ত ঘুমের চাপের কারণে কিংবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকের কারণে তাহাজ্জুদের পাবন্দি করা সম্ভব হয় না। অবশ্য বাড়ীতে থাকা অবস্থায় যদি কোন কোন সময়

তাহাজ্জুদ পড়িয়া লওয়া হয়, তবে হয়ত এইভাবেও উহার প্রতি আগ্রহ পয়দা হইয়া অপরাপর প্রতিবন্ধকগুলিও দূর হইয়া যাইতে পারে। অনুরূপভাবে বাড়ীতে থাকিয়া (নফল) রোজা রাখাও কষ্টকর হয়। কেননা, ঘরে বিবিধ প্রকার সুস্বাধু খাবারের আয়োজন থাকে– যাহা ত্যাগ করিয়া রোজা রাখিতে মন চাহে না। তবে বাড়ীতে যদি মামুলী ধরনের খাবার থাকে, তবে হয়ত রোজা রাখিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। সফরের হালাতে যেহেতু মানুষ বাড়ী ঘরের সহজলভ্য নেয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত থাকে, এই কারণে তখন তাহার পক্ষে সহজে রোজা রাখা সম্ভব হয়। এই রোজাকে রিয়ার কারণে বলা হইবে না, বরং ইহা দ্বীনী জযবার কারণেই রাখা হইতেছে। কেননা, নফসের খাহেশাত হইল রোজার জন্য প্রতিবন্ধক। আর এই খাহেশাত দ্বীনী চেতনার উপর প্রবল থাকে। তো মানুষ যখন নফসের এই খাহেশাত হইতে মুক্ত থাকে তখন তাহার দ্বীনী চেতনাও প্রবল হয়।

এদিকে শয়তান কিন্তু এই সময়ও বসিয়া থাকে না। বরং এই সময় সে মানুষকে এই বলিয়া আমল হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে যে, এইভাবে মানুষের দেখাদেখি আমল করিলে তাহা রিয়ার মধ্যেই গণ্য হইবে। তুমি যখন ঘরে একাকী থাকিতে তখন তো এইরূপ এবাদত করিতে না। কিন্তু এখন কেন করিতেছ? এখন মানুষকে দেখাইবার জন্যই এবাদত করিতেছ। সুতরাং তোমার এই এবাদত সুস্পষ্ট রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। অর্থাৎ শয়তান এইভাবেই মানুষকে কুপরামর্শ দিয়া কেবল তাহার নিয়মিত এবাদতের মধ্যেই সীমিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং অতিরিক্ত কোন এবাদত করিলে উহাকে রিয়া সাব্যস্ত করিয়া উহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার প্রয়াস চালায়।

আরেকটি অবস্থা হইল, মানুষ অনেক সময় অপর কাহাকেও এবাদত করিতে দেখিয়া তাহার নিন্দার ভয়ে এবং অলসতা ও গাফলতির অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু অতিরিক্ত এবাদত করিতে চায়। বিশেষতঃ তাহার সম্পর্কে যদি এইরূপ পরিচিতি থাকে যে, "এই ব্যক্তি রাত জাগিয়া এবাদত করে" তবে তো সে কিছুতেই তাহার এই সুনাম ক্ষুণ্ন হইতে দিতে চাহিবে না। বরং উত্তরোত্তর নিজের এই সুনাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু অতিরিক্ত এবাদত অবশ্যই অব্যাহত রাখিবে। অথচ মানুষের চিরশত্রু শয়তান এই অবস্থায় মানুষকে নামাজের প্রতি উৎসাহিত করিয়া বলে যে, তুমি নামাজ পড়িতে থাক কেননা, তুমি প্রকৃত অর্থেই একজন মোখলেস বান্দা এবং রিয়া হইতে মুক্ত। তুমি তো কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িতেছ। ইতিপূর্বে তুমি বিবিধ প্রতিবন্ধক ও কর্ম ব্যস্ততার কারণেই রাত জাগরণ করিতে পার নাই। এখন তোমার সেইসব ব্যস্ততা না থাকার কারণেই নামাজ পড়িতেছ। তোমার ইচ্ছা ইহা নহে যে, মানুষ যেন তোমাকে এবাদত করিতে

দেখিতে পায়। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেই শয়তান মানুষকে এবাদত হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিয়াছে এখন সেই শয়তানই তাহাকে এবাদতের প্রতি উৎসাহিত করিতেছে।

এখন এই ফায়সালা কেবল অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন আল্লাহওয়ালাগণই করিতে পারেন যে, এই অতিরিক্ত নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়া হইতেছে, না বান্দাকে দেখাইবার জন্য পড়া হইতেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে উহার ফায়সালা করা সম্ভব নহে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, রিয়ার কারণেই এই নামাজ পড়া হইতেছে, তবে অতিরিক্ত নামাজ না পড়াই ভাল। চাই তাহা এক রাকাতই হউক। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে মানুষকে খুশী করা, আল্লাহর নাফরমানী বটে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত নামায যদি এই কারণে পড়া হয় যে, ইতিপূর্বে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে যেই প্রতিবন্ধক ছিল এখন তাহা দূর হইয়াছে কিংবা অপরকে এবাদত করিতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া বা নেক কাজে প্রতিযোগিতার জযবায় যদি এই নামাজ পড়া হয়– তবে অবশ্যই পড়িবে। এই শেষোক্ত অবস্থাটির লক্ষণ হইল– নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তুমি যদি এমন কোন জায়গা হইতে তাহাদিগকে দেখিতে, যেখান হইতে তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না– তখনো তুমি এই নামাজ পড়িতে কি-না। যদি সেই অবস্থায়ও নামাজের প্রতি মনের আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তবে অবশ্যই নামাজ পড়িবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে এখলাসের সহিত আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড়া হইতেছে। পক্ষান্তরে এই অবস্থায় নামাজ পড়িতে যদি কষ্ট অনুভব হয়, তবে নামাজ বর্জন করিবে। কেননা, এই নামাজের উৎস হইল রিয়া। মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশেই এই নামাজ পড়া হইতেছে।

অনেক সময় জুমুআর দিন বেশ জাঁকজমকের সহিত মসজিদে যাওয়া হয়। অথচ অন্য কোন দিন এইভাবে মসজিদে যাওয়া হয় না। এখন জুমুআর দিন এইভাবে মসজিদে যাওয়া এই কারণেও হইতে পারে যে, উহার মাধ্যমে সে মানুষের প্রশংসা কুড়াইতে চাহে। কিংবা উহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, জুমুআর দিন মানুষ যেহেতু আগ্রহের সহিত দলে দলে মসজিদে যাইতেছে, আল্লাহর প্রতি মানুষের এই মনোযোগ দেখিয়া হয়ত তাহার মনের অলসতা দূর হইয়া তদস্থলে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ও জযবা পয়দা হইল। আবার অনেক সময় এইরূপও হইতে পারে যে, মানুষের আগ্রহ দেখিয়া তাহার অন্তরেও দ্বীনী জযবা পয়দা হইল এবং উহার পাশাপাশি এই খাহেশও পয়দা হইল যে, মানুষ যেন মসজিদে যাইতে দেখিয়া তাহাকেও আবেদ ও জাহেদ মনে করে এবং তাহার প্রশংসা করে। এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, অন্তরে কোন্ অবস্থাটি প্রবল। যদি দ্বীনী জযবা প্রবল হয়, তবে নিছক এই কারণে আমল বর্জন করা যাইবে না যে, অন্তরে প্রশংসাপ্রীতিও বিদ্যমান। বরং এই ক্ষেত্রে নফসকে এইভাবে বুঝাইবে

যে, এবাদতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা কুড়াইবার খাহেশ করা ভাল নহে। কেননা, উহার ফলে এবাদতের ছাওয়াব নষ্ট হইয়া যায়।

বর্ণিত ওয়াসওয়াসাসমূহের চিকিৎসা

উপরে নফসানী ও শয়তানী খাহেশাত সমূহের বিবরণ উল্লেখ করা হইল। এইসব অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার উপায় হইল, এইরূপ ক্ষেত্রে নিজের চিন্তাকে বিপরীতমুখী করিয়া মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, মানুষ যদি আমার বাতেনী নেফাক ও ত্রুটিসমূহ জানিতে পারে এবং আমার পিছনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়, তবে তাহারা আমার উপর কি পরিমাণ ঘৃণা পোষণ করিবে? তো আমার বাস্তব অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ার পর মানুষের নিকটই যদি আমি এতটা ঘৃণার পাত্রে পরিণত হই, তবে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? তিনি তো সর্বজ্ঞ এবং সকল কিছু জানেন ও বুঝেন। মানুষের এমন কোন গোপন অবস্থা নাই যাহা তিনি অবগত নহেন।

কথিত আছে যে, একবার হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) জিকিরের আওয়াজ শুনিয়া কম্পিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এই সময় অপর এক ব্যক্তিও তাঁহার অনুকরণে দাঁড়াইয়া উঠিল। হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ =

অর্থঃ "যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাজে দণ্ডায়মান হন।"

(সূরা আশশোয়ারাঃ আয়াত ২১৮)

উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলঃ হে শায়েখ! আল্লাহ পাক আপনার দণ্ডায়মানের অবস্থা এবং উহার কারণ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং কি কারণে আপনি এইরূপ লৌকিকতা করিতেছেন? এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বসিয়া পড়িল।

এইসব হইল নেফাকপূর্ণ আমল। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীস–

تعوذوا بالله من خشوع النفاق

অর্থঃ "নেফাকের খুশু ও বিনয় হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

(বায়হাকী)

এই ধরনের অবস্থা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা ও এস্তেগফার করা উচিৎ। কেননা, এইসব অবস্থা কখনো ভয়, গোনাহের স্মরণ এবং গোনাহের উপর অনুশোচনার কারণে হইয়া থাকে। আবার রিয়ার কারণেও হইয়া থাকে।

উপরে যেইসব ওয়াসওয়াসার কথা উল্লেখ করা হইল, মানুষের অন্তরে উহা প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একটির সঙ্গে অপরটির সাদৃশ্যতাও পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে যখনই তোমার অন্তরে কোন খেয়াল বা ওয়াসওয়াসা আসে, তখনই তুমি নিজের অন্তরের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখিবে যে, এই খেয়াল বা ওয়াসওয়াসা কি কারণে এবং কোথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। যদি আল্লাহর জন্য হইয়া থাকে, তবে হইতে দাও এবং সেই সঙ্গে অন্তরে ভয়ও পোষণ করিতে থাক। কেননা, মানবাত্মায় রিয়া এমনই সঙ্গোপনে আসিয়া আক্রমণ করে যে, অনেক সময় উহার উপস্থিতি অনুভবও করা যায় না। এমনও হইতে পারে যে, তুমি যেই আমলটি এখলাসের সহিত শুরু করিয়াছ, পরবর্তীতে উহাতে রিয়া আসিয়া যুক্ত হইল। সুতরাং এই কথা চিন্তা করিয়া অন্তরে সর্বদা ভয় পোষণ করিতে থাক যে, আল্লাহ পাক তোমার প্রতিটি কথা, কর্ম ও তোমার মনের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং তোমার আমলে যদি সামান্যতম রিয়ারও সংমিশ্রণ ঘটে তবে তোমাকে তাহার আজাবের শিকার হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তুমি সেই ঘটনাটিকেও স্মরণে আনিতে পার যেই ঘটনায় হযরত আইউব (আঃ)-এর খেদমতে আগত তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে আইউব! আপনি কি ইহা জানেন না যে, বান্দার এমন আমল বাতিল হইয়া যাইবে যাহা দ্বারা সে আপন আত্মাকে প্রতারিত করিত? আর সে কেবল নিজের গোপন আমলেরই বিনিময় প্রাপ্ত হইবে।

জনৈক বুজুর্গ এইরূপ দোয়া করিতেনঃ আয় আল্লাহ! আমি এই বিষয় হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি যে, লোকেরা আমার ভয়ের অবস্থা অবগত হয় আর আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন। হযরত আলী ইবনে হোসাইন এইরূপ দোয়া করিতেনঃ আয় আল্লাহ! আমি এই অবস্থা হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যে, (১) মানুষের নজরে আমার বাহ্যিক অবস্থা উত্তম হয়, আর আপনার নিকট আমার বাতেনী অবস্থা মন্দ হয়। (২) আমি এমন সব আমলের হেফাজত করি, যাহা মানুষকে দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে আর এমন সব আমল বরবাদ করিয়া দেই, যাহা আমার জন্য করা হইয়াছে। (৩) মানুষের জন্য আমার উত্তম আমল সমূহ জাহির করি, আর নিকৃষ্ট আমল সমূহ লইয়া আপনার খেদমতে হাজির হই। (৪) নেক আমল সমূহের মাধ্যমে মানুষের নৈকট্য প্রার্থনা করি এবং বদ আমল সমূহ লইয়া আপনার দরবারে হাজির হই। আর আমার উপর আপনার গজব নাজিল হয়। আয় আল্লাহ! আমাকে এইরূপ রিয়া ও মোনাফেকী আচরণ হইতে হেফাজত করুন।

উপরে বর্ণিত হযরত আইউব (আঃ)-এর খেদমতে আগত তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিল যে, হে আইউব! আপনি কি ইহা জানেন না যে, যেই সকল লোক তাহাদের প্রকাশ্য আমলের হেফাজত করে, আর গোপন

আমলকে বরবাদ করিয়া দেয়, তাহাদের চেহারা সেই কঠিন সময়ে মলিন হইয়া যাইবে যখন তাহারা আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইবে।

উপরে রিয়ার অনিষ্ট এবং উহার বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। মানুষের উচিৎ রিয়ার যাবতীয় অনিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকেফ হইয়া এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে- রিয়ার সত্তরটি দরজা আছে। তো এই সর্বনাশা রিয়া এমনই সূক্ষ্ম যে, অনেক সময় উহার উপস্থিতি অনুমানও করা যায় না। এমনকি রিয়ার চলন-পিপীলিকার চলন হইতেও নীরব ও গোপন। সুতরাং উহার উপস্থিতি টের পাইতে হইলে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বরং আমরা তো বলি, কঠিন মোজাহাদা ও সর্বোচ্চ সতর্কতার পরও যদি উহার উপস্থিতি অনুভব করা যায় তবুও তাহা গনীমত বটে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এইসব বিপদ হইতে হেফাজত করুন।

এবাদতের আগে-পরে ও এবাদতের সময় মানুষের কর্তব্য

একজন মোমেনের অন্যতম কর্তব্য হইল, নিজের যাবতীয় এবাদতের ব্যাপারে কেবল আল্লাহ পাকের অবগতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। বস্তুতঃ আল্লাহর অবগতিতে কেবল এমন ব্যক্তিগণই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, যাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেদের সর্ববিধ কামনা-বাসনা কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতেই পূরণ হইবে- এমন বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে যাহারা গায়রুল্লাহকে ভয় করে এবং তাহাদের পক্ষ হইতে পাওয়ার আশা করে, তাহারা অবশ্যই নিজেদের আমল মানুষকে দেখাইতে আগ্রহী হইবে। সুতরাং কেহ এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে নিজের আকল ও ঈমানের সাহায্যে উহাকে খারাপ মনে করা উচিৎ। কেননা, উহার ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশংকা রহিয়াছে। বিশেষতঃ কখনো যদি কোন কঠিন ও দুরূহ এবাদত সম্পন্ন করা হয়- যাহা সচরাচর মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হয় না, তবে সেই ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার সহিত আপন নফসের হেফাজত করিতে হইবে। কেননা, এইরূপ জবরদস্ত এবাদত সম্পন্ন করার পর নফস ইহা কামনা করিতেই পারে যে, আমার এই এবাদত সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা উচিত। কেননা, সে মনে করিবে, জনসাধারণ হয়ত আমার এই মহান এবাদত ও খোদাভীতির কথা জানিতে পারিলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহারা আমাকে সেজদা করিতে শুরু করিবে। সুতরাং আমার এই এবাদত গোপন রাখা ঠিক হইবে না। মানুষ যদি আমার এই এবাদতের কথা জানিতে না পারে, তবে কেমন করিয়া তাহারা আমার কদর বুঝিবে?

মোটকথা, এইসব ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতার সহিত মজবুত থাকিতে হইবে। আমলের মূল্য যথাস্থানে হইবেই। দুনিয়াতেও উহার মূল্য আছে। কিন্তু

পরকালে আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেই নেয়মত পাওয়া যাইবে, উহার সহিত দুনিয়ার মূল্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তদুপরি পরকালের প্রাপ্তি হইবে চিরস্থায়ী। একবার পাওয়ার পর উহা আর কখনো শেষ হইবে না। বরং উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। এদিকে আল্লাহ পাকের আজাব ও গজবও বড় কঠিন। যাহারা মানুষের নিকট এবাদতের বিনিময় প্রত্যাশা করিবে, তাহারা সেই আজাবের শিকার হইবে। মানুষের নিকট এবাদত প্রকাশ করিয়া যদি তুমি আত্মতৃপ্তি লাভ কর, তবে তোমার এই এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট উহার কোন বিনিময় পাইবে না। মনকে এইভাবে বুঝাইবে যে, মহা মূল্যবান এবাদতের বিনিময়ে মানুষের তুচ্ছ প্রশংসা ক্রয় করা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? অথচ মানুষের হাতে এমন কোন ক্ষমতাও নাই যে, সে মানুষের রিজিক দিবে বা মানুষকে মারিয়া ফেলিবে। অর্থাৎ এই সমস্ত বিশ্বাস অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করিয়া লইবে যেন মনে কখনো এইরূপ হতাশা আসিতে না পারে যে, আমাদের পক্ষে কি আর পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত আমল করা সম্ভব ? ইহা হইল মনের হতাশা। অন্তরে কখনো এই ধরনের খেয়াল ও হতাশা পয়দা হইলে উহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং এইসব ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া কখনো এখলাস বর্জন করিবে না। বরং এইরূপ মনে করিবে যে, যাহারা মোত্তাকী ও খোদাভীরু তাহাদের তুলনায় যাহারা মোত্তাকী নহে, তাহাদের আমলেই এখলাসের প্রয়োজন বেশী। কারণ, পরহেজগারদের নফল আমল যদি বাতিলও হইয়া যায়, তবুও তাহাদের ফরজ আমল তো যথাস্থানে ঠিকই থাকিবে। কিন্তু যাহারা মোত্তাকী নহে, তাহাদের তো ফরজ আমলও ত্রুটিপূর্ণ হয়। তাহাদের এই ত্রুটি নফল আমল দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। যদি নফল আমল সঠিক না হয়, তবে ফরজ আমল ত্রুটিপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। এই কারণেই যাহারা মোত্তাকী নহে, তাহাদের আমলে এখলাসের প্রয়োজন বেশী।

নফল দ্বারা ফরজের ক্ষতিপূরণ

হযরত তামীম দারী হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

يحاسب العبد يوم القيامة - فان نقص فرضه قيل انظروا هل له من تطوع اكمل به فرضه و ان لم يكن له تطوع اخذ بطرفيه فالقى في النار

অর্থঃ "কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের সময় যদি ফরজের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তবে হুকুম হইবে যে, তাহার কোন নফল আমল আছে কি-না দেখ। যদি কোন নফল আমল থাকে তবে উহা দ্বারা ফরজের ত্রুটি পূরণ করা

হইবে। যদি কোন নফল আমল পাওয়া না যায়, তবে হাত-পা ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।" (ইবনে মাজা)

ইহা দ্বারা জানা গেল, যাহাদের আমলে এখলাস ও রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তাহাদের পক্ষেই অধিক আমলের প্রয়োজন হইবে, যেন নফল আমল দ্বারা তাহাদের ত্রুটিপূর্ণ ফরজ আমলের ক্ষতিপূরণ করা যায়। কেননা, এইসব লোকেরা কেয়ামতের দিন ত্রুটিপূর্ণ ফরজ আমল ও প্রচুর গোনাহ লইয়া হাজির হইবে। সুতরাং তাহাদের ফরজ আমলের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ এবং গোনাহের কাফফারা নফল আমলের এখলাস ছাড়া সম্ভব নহে। পরহেজগার ও মোত্তাকীগণ নিজেদের পারলৌকিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও দরজা বুলন্দির জন্য এখলাসের উপর মেহনত করিবে। তাহাদের নিকট যদি নফল এবাদতের ভাণ্ডার নাও থাকে, তবুও তাহারা এই পরিমাণ কল্যাণ লইয়া হাজির হইবে যাহা তাহাদের গোনাহের তুলনায় বেশী হইবে এবং উহার ফলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। সুতরাং নফল এবাদতের নিরাপত্তা এবং উহা ছহী ও যথার্থ হওয়ার লক্ষ্যে অন্তরে সর্বদা এই ভয় পোষণ করিতে হইবে যেন এবাদতসমূহ আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ অবগত হইতে না পারে।

মোটকথা, আমল হইতে ফারেগ হওয়ার পরও এই চেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে যেন এই আমলের কথা অপর কেহ জানিতে না পারে। উহার উপায় হইল, আমল সম্পাদনের পর কাহারো সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা না করা। উহার পরও অন্তরে এই ভয় পোষণ করিবে যে, আমার অজান্তে এবং অতি সঙ্গোপনে আমার আমলে রিয়ার সংমিশ্রণ হইয়া গেল কি-না। মনে করিবে, এতসব সংশয়-সন্দেহ ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনার পর আমার আমল কবুল হইবে কি-না তাহা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এমনও হইতে পারে যে, আল্লাহ পাক আমার মনের গোপন নিয়ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহার ফলেই তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমার আমল প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছেন। এই ভয় ও সংশয়-সন্দেহ আমলের সময় ও আমলের পরে হওয়া উচিৎ— আমলের শুরুতে নহে। আমলের শুরুতে বরং নিজের এখলাস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে যে, আমি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই আমল করিতেছি এবং এই আমলের পিছনে আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমলের শুরুতে এখলাসপূর্ণ নিয়ত এই কারণে জরুরী যেন আমল সঠিক হয়। আমল শুরু হওয়ার পর যখন এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইবে, যেই সময়ের মধ্যে কোনরূপ অসাবধানতা ও ভুল হওয়া সম্ভব, তখনই আশংকা করা সমীচীন হইবে যে, এই ফাকে আমার আমলে কোনরূপ রিয়া বা আত্মপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, যার ফলে হয়ত আমার আমল বাতিলও হইয়া যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও ভয়ের তুলনায় এবাদত কবুল হওয়ার আশা

প্রবল হওয়া উচিৎ। কেননা, এবাদতের মধ্যে তো এখলাস অবশ্যই আছে। এখন রিয়ার কারণে উহা বাতিল হইয়া গিয়াছে কি-না এই বিষয়ে সন্দেহ। অর্থাৎ এবাদত বাতিল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নহে। সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ে আশাবাদী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই আশাবাদের কারণেই এবাদত ও মোনাজাতে তৃপ্তি অনুভূত হয়। কেননা এখানে এখলাস নিশ্চিত এবং রিয়াতে সন্দেহ। এই সন্দেহের কারণে সৃষ্ট 'ভয়' সন্দেহযুক্ত বিষয়টির কাফ্ফারাও হইয়া যাইতে পারে।

মানুষের উপকার করা এবং মানুষকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ছাওয়াবের আশা করা উচিৎ। কেননা, যেই ব্যক্তির উপকার করা হইবে, তাহার মনখুশী হইবে এবং সেই ব্যক্তিকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দেওয়া হইবে, সে ঐ শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে। এইগুলি ছাওয়াবের কর্ম বটে। এখানে সতর্কতার বিষয় হইল এই উভয় ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর নৈকট্য ও ছাওয়াবের আশা করা উচিত। শিক্ষার্থী বা উপকৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান বা প্রশংসাপ্রাপ্তির আশা করা উচিৎ নহে। কেননা, এইরূপ করিলে আমলের ছাওয়াব বরবাদ হইয়া যাইবে।

শিক্ষার্থীদের দ্বারা কোন কাজ আদায় করা বা তাহাদের দ্বারা খেদমত করানো, মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পথে তাহাদিগকে সঙ্গে রাখা কিংবা কোন প্রয়োজনে তাহাদিগকে কোথাও পাঠানো– ইত্যাদির অর্থ হইতেছে, সে যেন তাহার শ্রমের বিনিময় আদায় করিয়া লইয়াছে। এখন আর উহার ছাওয়াবের আশা করা নিরর্থক। অবশ্য উস্তাদ যদি শাগরিদের পক্ষ হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা না করে এবং শাগরিদ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উস্তাদের খেদমত করে, তবে আশা করা যায়, ছহী নিয়তের কারণে উস্তাদ ছাওয়াব পাইবেন। তবে শর্ত হইল, শাগরিদের পক্ষ হইতে খেদমতের অপেক্ষায় না থাকা এবং সে যদি খেদমত না করে, তবুও তাহার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ না করা। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ এইরূপ শর্তসাপেক্ষেও এই ধরনের খেদমত বর্জন করিয়া চলিতেন।

কথিত আছে যে, একবার জনৈক বুজুর্গ উস্তাদ পথ চলার সময় কেমন করিয়া এক কূপের ভিতর পড়িয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে আশ পাশের লোকেরা তাহাকে উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া আসিয়া কূপের ভিতর রশি ফেলিল। কিন্তু কূপের ভিতর হইতে বিপন্ন বুজুর্গ সকলকে কসম দিয়া বলিলেন, যেই ব্যক্তি আমার নিকট পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করিয়াছে বা একটি হাদীসও শিক্ষা করিয়াছে, সে যেন এই রশি স্পর্শ না করে। অর্থাৎ তিনি আশংকা করিতেছিলেন, শাগরিদদের পক্ষ হইতে এই খেদমত গ্রহণের কারণে যেন শিক্ষাদানের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়।

হযরত শাকীক বলখী বলেন, একবার আমি হযরত সুফিয়ান ছাওরীর খেদমতে একটি কাপড় হাদিয়া পেশ করিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। আমি আরজ করিলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! যাহারা আপনার নিকট হাদীস পাঠ করে আমি তো তাহাদের দলভুক্ত নহি। তবুও কী কারণে আপনি আমার হাদিয়া গ্রহণ করিতেছেন না? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি জানি যে, তুমি আমার নিকট হাদীস পড় না, কিন্তু তোমার ভাই তো পড়ে। সুতরাং আমার আশংকা হইতেছে যে, এই হাদিয়ার কারণে হয়ত আমার মন তোমার ভাইয়ের প্রতি অন্যদের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে।

একবার হযরত সুফিয়ান ছাওরীর খেদমতে এক ব্যক্তি একটি টাকার থলি লইয়া আসিল। লোকটির মরহুম পিতা ছিলেন হযরত সুফিয়ানের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তিনি মাঝে মধ্যে হযরত সুফিয়ানের নিকট আসা যাওয়া করিতেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী লোকটির পিতার খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাহার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিলেন। পরে লোকটি সেই টাকার থলেটি হযরত সুফিয়ানের খেদমতে পেশ করিয়া বলিল, এই টাকা আমি পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এই টাকার কিছু অংশ আপনাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং আপনার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করুন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী উপস্থিত ঐ হাদিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লোকটি চলিয়া যাওয়ার পরই নিজের ছেলেকে পাঠাইয়া সেই লোকটিকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন, ভাতিজা! তুমি এই থলিটি ফেরৎ লইয়া যাও। আমি কিছুতেই ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কেননা, তোমার পিতার সঙ্গে আমার মোহাব্বত ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে– যাহা একটি উত্তম আমল এবং উহার বিনিময়ে আমি ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা করিতেছি। কিন্তু এই হাদিয়া গ্রহণের ফলে এমনও হইতে পারে যে, আমার অকৃত্রিম মোহাব্বতের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ জড়াইয়া পড়িবে এবং আমি ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইব।

হযরত সুফিয়ান ছাওরীর ছেলে মোবারক বলেন, লোকটি তাহার টাকার থলি লইয়া চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিতার খেদমতে আরজ করিলাম, আপনি ঐ হাদিয়া ফিরাইয়া দিলেন কেন? ইচ্ছা করিলে তো আপনি উহা গ্রহণও করিতে পারিতেন। আপনার ঘরে ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও ভ্রাতাগণ আছে। তাহাদের প্রতি কি আপনার কোন দয়ামায়া নাই? জবাবে হযরত সুফিয়ান ছাওরী বলিলেন, বেটা মোবারক! তোমরা ভোগ করিবে আর আমি জবাবদিহি করিব, ইহা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কাহারো দ্বারা যদি অপর কেহ হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তবে আল্লাহ পাকের নিকটই উহার ছাওয়াব

প্রত্যাশা করা উচিৎ। একজন তালেবুল এলেমেরও কর্তব্য, কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই ছাওয়াব ও মর্যাদা প্রার্থনা করা।

অনেক সময় তালেবুল এলেম হয়ত মনে করে, ভালভাবে আল্লাহর এবাদত করিলে উস্তাদের নেক নজর এবং তাঁহার ফয়েজ ও বরকত অধিক হাসিল হইবে এবং লেখাপড়ায়ও উন্নতি হইবে। এই ধারণা সঠিক নহে। বরং মানুষকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবাদত করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিশ্চিত। পক্ষান্তরে এলেম হাসিল করিতে পারিলেই উপকৃত হওয়া নিশ্চিত নহে। অর্থাৎ উস্তাদ হইতে হাসিলকৃত এলেম দ্বারা যেমন উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তদ্রূপ উহা দ্বারা উপকৃত না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং একটি সন্দেহযুক্ত উপকারের আশায় নিশ্চিত ক্ষতির শিকার হওয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না। তো একজন তালেবুল এলেমের কর্তব্য হইল, আল্লাহর জন্য এলেম হাসিল করিবে এবং তাহার জন্যই এবাদত করিবে। উস্তাদের খেদমতও আল্লাহর ওয়াস্তেই করিবে। এই নিয়তে উস্তাদের খেদমত করিবে না যে, উহার ফলে তাঁহার সুদৃষ্টি হাসিল করা যাইবে। এবাদতের মাধ্যমে যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করিতে হয়, তবে নিয়তের পরিশুদ্ধি আবশ্যক।

বান্দাকে হুকুম করা হইয়াছে যেন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো উদ্দেশ্যে এবাদত করা না হয়। অনুরূপভাবে পিতামাতার সেরা যত্নও এই নিয়তে করা ঠিক নহে যে, এই সেবাযত্নের মাধ্যমে তাঁহাদের সুদৃষ্টি অর্জন করা যাইবে। বরং উহাকে আল্লাহ পাকের নির্দেশ মনে করিয়াই করিতে হইবে। মনে করিবে– পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত।

সংসার বিরাগী আবেদ ও সূফী-সাধকগণের কর্তব্য, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং এবাদত-বন্দেগী প্রশ্নে তাঁহার অবগতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। এমন ধারণা করা ঠিক নহে যে, আমার এবাদত ও মোজাহাদা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকেও অবহিত করিতে হইবে যেন তাহারা আমাকে ইজ্জত করিতে পারে। এইরূপ ধারণাই অন্তরে রিয়ার বীজ বপন করিয়া দেয় এবং পরবর্তীতে উহা পত্র পল্লবিত হইয়া মানুষের আমলকে বরবাদ করিয়া দেয়। একজন আবেদ যখন জানিতে পারে যে, তাহার এবাদত-বন্দেগী ও তপস্যার কথা সাধারণ মানুষ জানিতে পারিয়াছে, তখন নির্জনে কঠিন এবাদত করিয়াও সে এক অনাবিল আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এই পর্যায়ে তাহার মোজাহাদা ও সাধনার কষ্ট সহজ হইয়া যায়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে সে এবাদত-বন্দেগী ও সাধনার সুকঠিন পর্যায়গুলি যে কেমন করিয়া অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, আমি মারেফাত শিক্ষা করিয়াছি

জনৈক রাহেবের নিকট হইতে। এই রাহেব বা খৃষ্টধর্মযাজকের নাম ছিল সুমআন। এক দিন আমি সেই রাহেবের এবাদতখানায় গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে কতদিন যাবৎ অবস্থান করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি ক্রমাগত সত্তর বৎসর যাবৎ এখানে অবস্থান করিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি খাবার হিসাবে কি গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়া তিনি পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাকে এইসব প্রশ্ন করিতেছ? আমি বলিলাম, নিছক কৌতুহলের কারণেই আমি প্রশ্ন করিতেছি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এইবার তিনি বলিলেন, তবে শোন, আমি বিগত সত্তর বৎসর যাবৎ প্রতি দিন কেবল একটি ছোলাবুট খাইয়া দিন গুজরান করিতেছি। প্রতি রাতে শয়নকালে এই একটি মাত্র বুট ছাড়া খাবার হিসাবে আমি আর কিছুই গ্রহণ করি না। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, বৃদ্ধ রাহেবের কথা শুনিয়া আমি অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এমন কি লাভবান হইয়াছেন যে, উহার বিনিময়ে সারা দিন মাত্র একটি ছোলাবুট খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আমার এই এবাদতখানার আশেপাশে যাহারা বসবাস করে, তাহারা বৎসরে একবার এখানে আসিয়া আমার এবাদতখানাকে সাজাইয়া গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া দিয়া যায় এবং তাহারা আমাকে অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এবাদত করিতে করিতে যদি আমার মনে কখনো কোন অলসতা আসে, তখন বৎসরের ঐ একদিনের ইজ্জত ও সংবর্ধনার কথা স্মরণ করিতেই আমার সারা বৎসরের কষ্ট প্রশমিত হইয়া আনন্দে ভরিয়া যায়। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে একত্ববাদে বিশ্বাসী! (তুমি আমার পথ অনুসরণ করিও না) তুমি বরং এক মুহূর্তের মেহনতের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের সুখ ও ইজ্জত হাসিল কর।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, রাহেবের উপরোক্ত নসীহত আমার জন্য এলেম ও মা'রেফাতের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি এতটুকুই জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, না আরো কিছু জানিতে চাও? আমি বলিলাম, আপনি যদি আরো কিছু বলেন, তবে আমি উপকৃত হইব। তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে এই এবাদতখানার নীচের কক্ষে চল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে গিয়া তিনি বিশটি ছোলা বুটের একটি পুরিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এইগুলি লইয়া তুমি উপরে যাও, সেখানে কৌতুহলী জনতা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাহেবের কথা মত আমি উপরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই সকলে জিজ্ঞাসা করিল, রাহেব তোমাকে কি দিয়াছে? আমি বলিলাম, তিনি নিয়মিত যেই খাদ্য গ্রহণ করেন তাহা আমাকে দান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা পূর্বাধিক

ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া বলিল, আমরা রাহেবের প্রতিবেশী এবং তাঁহার একান্ত ভক্ত। সুতরাং আমরাই উহার অধিক হকদার। তুমি উহা আমাদিগকে দিয়া দাও। আমি বলিলাম– না, এমনি দিব না, আমি উহা বিক্রি করিব। তাহারা উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে আমি বিশ দিনার চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিশ দিনার দিয়া আমার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইল। অতঃপর আমি সেই বিশ দিনার লইয়া বৃদ্ধ রাহেবের নিকট ফিরিয়া গেলে ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তুমি বিশ দিনার চাহিয়া ঠকিয়াছ। তুমি যদি বিশ হাজার দিনার দাবী করিতে, তবে তাহারা উহাই দিতে সম্মত হইত। হে একত্ববাদে বিশ্বাসী! ইহা সেই ব্যক্তির ইজ্জত, যে আল্লাহর এবাদত করে না; আর যেই ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর এবাদত করে তাহার ইজ্জত ও সম্মান কি হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তুমি তোমার রবের এবাদত করিতে থাক এবং এদিক সেদিক আনাগোনা করিও না।

উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যখন নিজের সম্মান ও খ্যাতির কথা জানিতে পারে, তখন নির্জনে মোজাহাদার শত কষ্টের ভিতরও এক প্রকার আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। আবার ক্ষেত্র বিশেষ এই খ্যাতির কথা সে অজ্ঞাত থাকে। যাহাই হউক, এইরূপ অবস্থা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। উহা হইতে নিরাপদ থাকার আলামত হইল, এবাদতের সময় আবেদের নজরে মানুষ ও জীব-জানোয়ার সমান হওয়া এবং কোন কারণে যদি মানুষ তাহার প্রতি বীত শ্রদ্ধ হইয়া পড়ে তবে বিরক্তবোধ না করা। মনে সামান্য বিরক্তির উদ্রেক হইলেও নিজের বিবেক ও ঈমানের সাহায্যে উহাকে দমন করিতে হইবে। এমতাবস্থায় নিজেকে এইভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন মানুষ দেখিতে পাইলেই এবাদত ও সাধনায় নিবিষ্টতা বৃদ্ধি না পায় এবং মানুষের অবগতির কারণে মনে আনন্দও না আসে। যদি সামান্য আনন্দও অনুভূত হয়, তবে মনে করিতে হইবে, ইহা মনের দুর্বলতার লক্ষণ। এই ক্ষেত্রে যদি ঈমান ও আকলের সাহায্যে এই অনিষ্টকে দমন করার চেষ্টা করা হয়, তবে আশা করা যায় এই চেষ্টা বৃথা যাইবে না।

মানুষ যখন আবেদকে দেখিতে পায় তখন এবাদতে অধিক নিমগ্ন হওয়া এবং ক্রমাগত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এবাদত করিতে থাকা যেন মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যায়– এই পন্থা উত্তম ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু শয়তান বসিয়া থাকিবে না। বরং সে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিবেই। অনেক সময় এবাদতে খুশু-খুজু ও নিমগ্নতা প্রকাশ করার ইচ্ছা মনে গোপন থাকে। অথচ এই সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, মানুষের সঙ্গে অধিক মিলামিশা আমার পছন্দ নহে এবং এই কারণেই আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এবাদতে নিমগ্ন থাকিয়া মানুষের সংশ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিতেছি।

অর্থাৎ বিলম্বের কারণে যেন লোকেরা বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার এই দাবী সত্য নহে। এই দাবীর সত্যতা এইভাবে যাচাই করা যাইতে পারে যে, মানুষের সঙ্গ হইতে পরিত্রাণের জন্য সে এবাদতের এই নিমগ্নতাকেই মাধ্যম বানাইল কেন? উহার জন্য তো এই উপায়ও অবলম্বন করা যাইত যে, সে হয়ত খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল বা মানুষের সম্মুখে গোগ্রাসে আহার করিতে লাগিল কিংবা অসঙ্গত ভঙ্গিমায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এইসব আচরণ দেখিয়াও তো মানুষ বীত শ্রদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে। সে এইসব পন্থা গ্রহণ করিল না কেন? অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যদি এবাদতে খুশু-খুজু জাহির করার পন্থা বর্জন করিয়া শেষোক্ত পন্থা সমূহ মানিয়া লয় তবে মনে করা যাইবে যে, সে তাহার দাবীতে সত্য এবং এবাদতে নিমগ্নতা প্রমাণের ক্ষেত্রে তাহার লোক দেখানো উদ্দেশ্য নাই। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি মানুষের আনাগোনা ও সমাগম দূর করার জন্য দীর্ঘ এবাদতে নিমগ্ন থাকার পদ্ধতির উপরই অধিক জোর দেয় তবে ইহা মনে করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না যে, মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কুড়ানোই তাহার আসল উদ্দেশ্য। এই অবস্থা হইতে কেবল সেই ব্যক্তিই নিরাপদ থাকিতে পারে যেই ব্যক্তি অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অপর কাহারো অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই এবং এইরূপ চিন্তা করিয়া যদি এবাদত করে যে, ভূপৃষ্ঠে কেবল আমিই এবাদত করিতেছি এবং আমাকে দেখার মত দুনিয়াতে দ্বিতীয় কোন মানুষ নাই। এইরূপ ব্যক্তির অন্তরে প্রথমতঃ মাখলুকের কোন ধারণাই পয়দা হইবে না এবং হইলেও উহা হইবে নেহায়েতই দুর্বল যাহা দূর করা কষ্টকর হইবে না।

উপরোক্ত অবস্থাটির লক্ষণ হইল– মনে কর, এক ব্যক্তির দুইজন বন্ধু আছে। একজন বিত্তবান এবং অপরজন গরীব। এখন তাহার ঘরে যদি বিত্তবান বন্ধুটি আগমন করে, তবে সে যেন গরীব বন্ধুটির আগমনের তুলনায় অধিক আনন্দিত না হয়। অবশ্য বিত্তবান বন্ধুটির মধ্যে যদি অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাহা ভিন্ন কথা। যেমন তিনি হয়ত ভাল আলেম বা মোত্তাকী ইত্যাদি। এই হিসাবে যদি গরীব বন্ধুর তুলনায় বিত্তবান বন্ধুকে অধিক ইজ্জত করা হয়, তবে এই ইজ্জত হইবে অর্থবিত্তের কারণে নহে; বরং এলেম ও তাকওয়ার কারণে। যেই ব্যক্তি বিত্তবান মানুষকে দেখিয়া অধিক খুশী হয়, সেই ব্যক্তি রিয়াকার বা অর্থ-লোভী। কেননা, সে যদি রিয়াকার ও লোভী না হইত তবে গরীব মানুষকে দেখিয়াই অধিক খুশী হইত। কারণ, গরীব ও নিরন্ন মানুষকে দেখিলে পরকালের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং গরিবী হালাত ও দৈন্য দশার প্রতি মোহাব্বত পয়দা হয়। পক্ষান্তরে মালদার ও বিত্তবানদিগকে দেখিলে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ এবং অর্থবিত্তের প্রতি মোহাব্বত পয়দা হয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মজলিসে দুনিয়াদার ও

বিত্তবানদিগকে নেহায়েত অবহেলার নজরে দেখা হইত। তাঁহার মজলিসে বিত্তবানদের বসিবার স্থান ছিল সকলের পিছনে এবং গরীবদের আসন ছিল সকলের সামনে। তিনি নিজেও এইরূপ বলিতেন, হায়! আমিও যদি গরীবদের দলভুক্ত হইতাম।

অবশ্য কোন মালদার ও বিত্তবান ব্যক্তি যদি তোমার নিকটাত্মীয় হয় বা তাহার সঙ্গে যদি তোমার কোন ঘনিষ্ঠতা থাকে কিংবা তোমার উপর যদি তাহার কোন হক থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অতিরিক্ত ইজ্জত করাতে কোন দোষ নাই। তবে শর্ত হইল, কোন গরীব ব্যক্তির সঙ্গেও যদি তোমার এই জাতীয় সম্পর্ক থাকে তবে তাহাকেও অনুরূপ ইজ্জত-একরাম করিতে হইবে। কেননা, আল্লাহ পাকের দরবারে তো গরীব-মিসকীনদের সম্মানই বেশী। এখন তুমি যদি কোন মালদারকে বেশী ইজ্জত কর, তবে উহার অর্থ দাঁড়াবে, তুমি তাহার সম্পদের প্রতি লালায়িত হইয়া তাহার সঙ্গে রিয়াসুলভ আচরণ করিতেছ।

এদিকে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যদি কোন ভেদাভেদ না করিয়া তাহাদিগকে একই সঙ্গে বসিতে দাও, তবে এই ক্ষেত্রে এইরূপ আশংকা রহিয়াছে যে, তুমি গরীবদের তুলনায় ধনীদের সম্মুখে হেকমত ও বিনয় অধিক প্রকাশ করিবে। ইহা গোপন রিয়া কিংবা গোপন লোভের পরিণতি। যেমন হযরত ইবনে ছাম্মাক (রহঃ) তাহার বাঁদীকে বলিয়াছিলেন, "ইহার কারণ কি তাহা আমি বলিতে পারিব না যে, আমি যখন বাগদাদ আসি, তখন আমার জ্ঞান ও হেকমতের দরজা খুলিয়া যায় এবং আমি আনর্গল হেকমতের কথা বলিতে পারি।" হযরত ইবনে ছাম্মাকের এই কথা শুনিয়া তাহার বাঁদী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, লোভের কারণেই তখন আপনার জবান তেজ হইয়া যায়। বাঁদীর এই উক্তি ছিল যথার্থ। অর্থাৎ ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, ধনী লোকদের সম্মুখে মুখের গতি যতটা সচল হয় এবং তাহাদের সম্মুখে যেই পরিমাণ বিনয় প্রকাশ করা হয়, সেই তুলনায় গরীবদের সামনে কিছুই করা হয় না।

রিয়া প্রসঙ্গে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও প্রতারণা এত অধিক ও ব্যাপক যে, লিখিয়া উহার বিবরণ শেষ করিবার মত নহে। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল, অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে সব বাহির করিয়া দেওয়া এবং সারা জীবন নফসের বিপদ ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা। স্মরণ রাখিও, নফসের খাহেশাত দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী খাহেশাতের জন্য নিজেকে কঠিন আজাবে নিপতিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। তোমার পক্ষে সঠিক ও সুস্থ জীবন যাপনের উপমা যেন এইরূপ- মনে কর, এক বাদশাহ শারীরিকভাবে অসুস্থ। জীবনের সমস্ত খাহেশাত ও কামনা-বাসনা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে এবং

সেইসব চাহিদা পূরণ করার উপায়-উপকরণও তাহার হাতের কাছেই মওজুদ। কিন্তু বাদশাহ এমনই এক ব্যাধিতে আক্রান্ত যে, তিনি যদি নিষিদ্ধ খাবার ও মনের চাহিদা পূরণে এক কদমও অগ্রসর হন, তবে তাহার স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতিসাধন কিংবা তাহার জীবন বিপন্ন হওয়ারও ঝুঁকি রহিয়াছে। তিনি ইহাও জানেন, যদি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সকল বিষয়ে পরহেজ করিয়া চলা হয়, তবে জীবনও রক্ষা পাইবে এবং রাজত্বও বহাল থাকিবে। এই কারণেই তিনি চিকিৎসকের কথা মানিয়া চলেন এবং নিয়মিত তিক্ত ঔষধ সেবন করেন। চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বল্প আহারের ফলে যদিও তাহার দেহটি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে কিন্তু এই নিয়ম পালন ও ঔষধ সেবনের ফলে তিনি আক্রান্ত ব্যাধি হইতেও মুক্তিও পাইতেছেন। এই পর্যায়ে যদি কোন নিষিদ্ধ খাবার খাইতে ইচ্ছা হয় তখন যেন তাহার ব্যাধিসমূহ মূর্তিমান হইয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে- যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও রাজত্বও শেষ হইয়া যাইবে। আর তাহার এই পরিণতি দেখিয়া শত্রুগণ যারপর নাই আনন্দিত হইবে। মোটকথা, এই ব্যক্তির নিকট যখনই তিক্ত ঔষধ সেবন কষ্টকর বলিয়া মনে হইবে, তখনই সে ঐ সুস্থ জীবনের কথা স্মরণ করিবে যাহা এই ঔষধ সেবনের মাধ্যমে হাসিল হইবে।

যেই মোমেন বান্দা পরকালের অন্তহীন সুখের জীবন কামনা করে, সে এমন প্রতিটি বিষয়ই পরহেজ করিয়া চলিবে যাহা পারলৌকিক জীবনের জন্য বরবাদীর কারণ হইতে পারে। অর্থাৎ, মোমেন ব্যক্তি পার্থিব জীবনের এমনসব আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে যাহা পারলৌকিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে। অতঃপর কেবল সেই যৎসামান্য অবস্থার উপরই তুষ্ট থাকিবে যাহা তাহার জন্য হালাল করা হইয়াছে। শীর্ণ দেহ ও শারীরিক দুর্বলতা, পেরেশানী, ভয় এবং মানুষের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্নতাকে সে এই কারণে পছন্দ করিবে যে, উহার বিপরীতে মানুষের সঙ্গে মিলামিশা করিয়া আনন্দ-ফুর্তিতে লিপ্ত হইলে আল্লাহর গজবের শিকার হইতে হইবে। এই কারণে সে দুনিয়ার যাবতীয় আনন্দ ও স্বাদ-সম্ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আখেরাতের মুক্তি কামনা করিবে। মোমেনের অন্তরের এই ভয় ও আশাই তাহাকে পার্থিব সুখ হইতে বিরত থাকার শক্তি যোগায়। কেননা, মোমেন বান্দার অন্তরে শেষ পরিণতির একীন বদ্ধমূল এবং সে মনে করে মানুষের চিরস্থায়ী সুখ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যেই নিহিত। সে ইহাও জানে যে, আল্লাহ পাক পরম করুণাময় ও মেহেরবান। যেই বান্দা তাঁহার মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে, তাহাকে তিনি সাহায্য করিবেন এবং তাহার সঙ্গে অনুগ্রহ ও দয়াসুলভ আচরণ করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট হইতে নিরাপদও রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আপন হেকমত ও ইনসাফ দ্বারা মানুষের ইচ্ছা ও

সততার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন

মানুষ যখন আল্লাহ পাকের রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে মেহনত-মোশাক্কাত ও সাধনার পথ বাছিয়া লয়, তখন সে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে পরিপূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই পর্যায়ে সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট তাহার নিকট সহজ মনে হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে সে সবর করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত-বন্দেগী তাহার নিকট একটি প্রিয় আমলে পরিণত হয়। এমন কি এবাদত বন্দেগী ও মোনাজাতের মধ্যে সে এমন এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব করে যে, উহার মোকাবেলায় দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্ভোগ তাহার নিকট একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়। মহান করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় বান্দার কোন মেহনতই বৃথা যাইতে দেন না এবং কোন প্রার্থীকেই তিনি খালী হাতে ফিরাইয়া দেন না। বরং তিনি তো বলেন, আমার দিকে যে এক বিঘত আগাইয়া আসিবে আমি তাহার দিকে এক হাত আগাইয়া যাইব। নেক লোকেরা আল্লাহ পাকের সাক্ষাতের জন্য যেই পরিমাণ আগ্রহী হয়, আল্লাহ পাক তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তদাপেক্ষা অধিক আগ্রহী হন। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ তাহাদের মেহনত মোশাক্কাত এবং এখলাস ও সততার পরিচয় দিবে; অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইবে, মহান করুনাময় আল্লাহ পাক তাহাদের সঙ্গে কতটা সদয় আচরণ করেন।

এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

।। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে সমাপ্ত ।।